কানাড়া দেখা হল না

সুবোধ কুমার চক্রবর্তী

জয়দীপ পাবলিকেশনস
দুই, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কোলকাতা-বারো

Kanara Dekha Holo Na

Bengali Travel Story

প্রকাশক ঃ
দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কোলকাতা-বারো

মুদ্রক ঃ
রবীন্দ্রনাথ সিংহ
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স
৪৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
কোলকাতা-নয়

প্রচ্ছদ ঃ
মনোজ বিশ্বাস

১লা বৈশাখ, ১৩৫৮

উৎসর্গ

ডক্টর শীতাংশু মিত্র

পরম প্রীতিভাজনেষু

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষের এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন হয়তো নিজের দেশটাকেই আমরা চিনতে পারব না। আজ যেখানে কোন পথ নেই, কিংবা পথ দুর্গম ও দুঃসাধ্য, বছর কয়েক পরে এসে দেখছি যে সেখানে মোটর বাস যাতায়াত করছে, কিংবা রেলের লাইন পাতা হচ্ছে। যে সব কঠিন তীর্থে যেতে মানুষ ভয়ে কাতর হত, দেখতে দেখতেই সে সব তীর্থ মানুষের হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছে।

আরব সাগরের তীরে ম্যাঙ্গালোর শহরে যাবার নামে আমার এই কথাই প্রথমে মনে এল। দক্ষিণ ভারতের নূতন প্রাণকেন্দ্র হল. ম্যাঙ্গালোর। ভারতের মানচিত্র খুলে দেখলাম, ঠিক আরব সাগরের তীরে একটি বিন্দু—তারই নাম ম্যাঙ্গালোর। এই নামের কয়েকটা অক্ষর আরব সাগরের নীল জলের উপরেই পড়েছে। উত্তরে গোয়া আর দক্ষিণে মালাবার—এরাও আরব সাগরের তীরে।

ম্যাঙ্গালোর বন্দর। বম্বে থেকে ম্যাঙ্গালোরে জাহাজেও আসা যায় আরব সাগরের পথে কোঙ্কণ উপকূলের শোভা দেখতে দেখতে। শুধু বর্ষার সময় মাস তিনেক এই পথ বন্ধ থাকে—জুন জুলাই আর অগস্ট মাসে। অন্য সময়ে সপ্তাহে দুদিন করে জাহাজ ছাড়ে।

যিনি আমাকে এই কথা বলেছিলেন, পরে তাঁর কথা বলব। তাঁর কাছে আমি আরও অনেক খবর পেয়েছিলাম। এমন সব খবর যা তাঁর কাছে না শুনলে কোন দিনই আমার জানা হত না।

ম্যাঙ্গালোরে যাবার দুটো পথ আমার জানা ছিল। যেটা সংক্ষিপ্ত বলে জানতাম, তাতে নাকি অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন। ট্রেনে ও বাসে অনেকবার ওঠা-নামা করতে হয়। ম্যাড্রাস থেকে ব্যাঙ্গালোরে বড় লাইনের গাড়িতে এসে ছোট লাইনের ট্রেনে আসতে হয়

মাইসোরে। সেখান থেকে ম্যাঙ্গালোরের বাস চলে কুর্গের প্রধান শহর মার্কারার উপর দিয়ে। ব্যাঙ্গালোর থেকে যে সরাসরি ম্যাঙ্গালোরে বাস যায়, তা পরে শুনেছি। অদূর ভবিষ্যতে ট্রেনও নাকি চলবে।

কিন্তু এ সব পথ আমার জানা ছিল না বলে আমি ট্রেনে আসাই নিরাপদ মনে করেছিলাম। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ, এবং মাদ্রাজ থেকে ম্যাঙ্গালোর। গোটা দক্ষিণ ভারত ঘুরে যেতে হবে। তা হোক। সময় মতো যে পৌঁছনো যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শৈশবে ভূগোলে পড়েছিলাম যে রাশিয়ায় মস্কো থেকে ভ্লাডি-ভোস্টকের মধ্যে চলে সবচেয়ে দূর পাল্লার ট্রেন। কিলোমিটারের হিসাব জানিনা। মাইলের হিসাবও ভুলে গেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন দূর পাল্লার ট্রেন আছে কিনা খোঁজ নেবার চেষ্টা করে জেনেছিলাম যে ট্রেন না থাকলেও থ্রু কোচ আছে। পেশাওয়ার থেকে যে ফ্রন্টিয়ার মেল দিল্লী আসে, তাতে একটা ম্যাঙ্গালোর কোচ আছে। দিল্লীতে সেই কোচ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে লাগে। তারপর মাদ্রাজ থেকে ম্যাঙ্গালোর মেলে যায় সেই কোচ। কত মাইল পথ, আর কত দিন সময় লাগে, সে সব কথা এখন মনে নেই। আর মনে থাকলেও কোন লাভ হত না। পেশাওয়ার এখন পাকিস্তানের শহর, অমৃতসর থেকে এখন ফ্রন্টিয়ার মেল ছাড়ে। দূরত্ব তাই এখন কমে গেছে।

পাটনা থেকে যখন আমি দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠেছিলাম তখন আমার এই সব কথা মনে এসেছিল। ম্যাঙ্গালোর কত দূর হবে, টাইম-টেবল দেখে একটা আন্দাজ করেছিলাম। প্রায় তিন হাজার কিলো-মিটার। মাইলের হিসেবে দু হাজার মাইলের কম। ম্যাঙ্গালোর পৌঁছতে কদিন সময় লাগবে, তার হিসাবও পেয়ে গিয়েছিলাম। চার দিনের যাত্রা, কলকাতা থেকে পুরো তিনটি দিন। অবশ্য ম্যাঙ্গালোর মেল ধরলে মাদ্রাজে একটা দিন সময় যায়—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সময়।

এত দীর্ঘ পথ একা কাটাবার কথা ভাবতেও ভয় হয়। পয়সা থাকলে লোকে কয়েক ঘণ্টায় উড়ে চলে যায়। আর তা না হলে রেল গাড়িতে শুয়ে গড়িয়ে ঘুমিয়ে, বই পড়ে আর অপরিচিত যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে, সময় কাটানো একটা দুরূহ ব্যাপার। অভ্যাস না থাকলে নরক যন্ত্রনা বলে বোধ হয়। আর অভ্যাস থাকলে—

না, থাক সে কথা। নিজের চোখে না দেখা থাকলে আপনাদের বিশ্বাস হবে না। ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র নেই বললে যেমন বিশ্বাস হবে না, এও তেমনি। মানচিত্রে সমুদ্র দেখেছেন নিজের চোখে। তেমনি রেলগাড়িতে পথ চলার অভিজ্ঞতাও আপনাদের আছে। তিন দিনের পথ ক্লান্তিকর হবে না, এ কথা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

কিন্তু সত্যি কথা হল, মোটর গাড়ি চালাবার মতো ভ্রমণ করাও শিখতে হয়। হিমালয়ের নিচের দিকে শিক্ষার দরকার নেই। হিমালয় নিজেই সব কৌশল শেখায়। দুর্গম পথ অতিক্রম করার শিক্ষা দুর্গম পথেই শেখায়। কিন্তু রেলে বেড়াবার শিক্ষা অন্য রকম। চেষ্টা থাকলে সেই শিক্ষাও হয় রেলে বেড়াতে বেড়াতে।

আমি তো কাজ নিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার নিজের বার্থে শুয়ে আর ঘুমিয়ে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু অভ্যাসের দোষে আমি হাওড়া ষ্টেশনে রিজার্ভেসন চার্টটা আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখি নিজের জায়গায় জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখবার পরে। কতো বিচিত্র নাম, ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের মতোই কৌতুহলজনক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই মাদ্রাজ-গামী ট্রেনে শুধু দক্ষিণ ভারতীয়রাই যাচ্ছে না, তাদের চেয়ে বেশি যাচ্ছে উত্তর ভারতের লোক। চেহারা দেখেই দেশ বোঝা যায়, এমন লোকও আছে।

হ্যাঁ, আমি একজন সর্দারজীর কথাই বলছি। তাঁর বিরাট পাগড়ি বাঁধা মাথাটি সরিয়ে নেবার পরেই পুরো চার্টটি আমি দেখতে পেলাম।

এ থেকে জি পর্যন্ত সাতটি কম্পার্টমেন্ট, তার মধ্যে দুটি দু বার্থের কুপে, বাকিগুলো চার বার্থের। চব্বিশটি বার্থেই প্যাসেঞ্জার আছে, কিন্তু নাম ছাপা হয়েছে অনেক কম। তার কারণ মিস্টার ও মিসেস আছেন। আর আছেন মিস্টার রঙ্গরাজন অ্যাণ্ড ফ্যামিলি। বাঙালী আর একজনও নেই।

এর পর যাত্রীদের দেখবার পালা। প্রতিটি কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের এক নজরে দেখে নিলাম। সবাই নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন, কিংবা বিছানা বিছিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছেন, কেউ বা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফলের দাম করছেন, কিংবা ট্রলির বই দেখছেন। ট্রেনে উঠবার সময় দু একখানা পেপার ব্যাক বই কেনার একটা রেওয়াজ আছে। কিন্তু সে সবই বিদেশী বই। হিন্দী বইও কিছু আছে, কিন্তু তার আভিজাত্য নেই। যাঁরা বই পড়েন, তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ি থেকে বই নিয়ে বেরোন। আর যাঁরা ষ্টেশনে বই কেনেন, তাঁরা কতকটা দেখানোর জন্যেই কেনেন। গোটা কয়েক পাতা উল্টেই বন্ধ করেন বই। তবে গল্প করে সময় কাটাতে চান, এমন যাত্রীর অভাব নেই। আমি সেই যাত্রী খুঁজি। কখনও পাই, কখনও পাই না। এমনি অভ্যাসের দোষে যদি কেউ আমাকে খুঁজে বার করেন, তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না।

এ যাত্রাতেও সেই রকমের ঘটনা ঘটল। গাড়ি ছাড়বার পরে কতকটা হতাশা হয়ে যখন আমি নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লাম, তখন এক ভদ্রলোক এসে আমাদের কামরায় মুখ বাড়ালেন। আর আমাকেই লক্ষ্য করে বললেন: অনেক দূরে যাবেন বুঝি?

পরিষ্কার বাঙলায় প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠলাম। আর আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করে ভদ্রলোক বললেন: আপনার সঙ্গী খোঁজা দেখেই বুঝেছিলাম যে আপনি দূরের যাত্রী।

নিজের বার্থে একটু সরে বসে আমি বললাম: বসুন।

ভদ্রলোক বসবার জন্যেই এসেছিলেন, বসে বললেন : কোন বাঙালীর নাম না দেখেই দমে গিয়েছিলেন তো! কিন্তু কলকাতায় অনেক বাঙালী মাদ্রাজী আছে। বাপের দেওয়া মাদ্রাজী নামটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তারা বাঙালী।

এঁর নামই যে রঙ্গরাজন, তা আমি বুঝতে পারলাম। তার কারণ এঁর সঙ্গে স্ত্রী ও এক কন্যা আছে বলে আমি তাঁর কামরার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলাম। খুব অল্প সময়ে তার সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। তিনি আমার নাম নিবাস পেশা ইত্যাদি সব কথাই জেনে নিলেন, নিজের পরিচয়ও দিলেন। দেখলাম যে এইখানে তাঁদের সঙ্গে আমাদের বেশ প্রভেদ আছে। আমরা বাঙালীরা অনেক দিন একসঙ্গে থেকেও যে সব প্রশ্ন করা সৌজন্য বিরুদ্ধ বলে ভাবি, এঁরা তা পরিচয়ের প্রথমেই জেনে নেন এবং পরিচয়ও দেন অকপটে। আলাপ সহজ হয়ে যায়, অন্তরঙ্গ হয়, এবং অনেক সময়েই উভয়ের পরিচিত বন্ধু বান্ধবের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক বললেন : কদিন থাকবেন ম্যাঙ্গালোরে ?

বললাম : থাকা কি আর হবে! কাজ হলেই ফিরে আসব।

—কিছু দেখবেন না সেখানে!

বললাম : সময় পেলে সমুদ্র দেখে আসব।

—সমুদ্র!

বলে অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন রঙ্গরাজন। তারপরে বললেন : ম্যাঙ্গলোরে পাহাড় দেখতে চাইলে পাহাড় দেখতে পাবেন, কিন্তু সমুদ্র দেখবার ইচ্ছা হলে নৌকোয় চেপে সমুদ্রের ধারে যেতে হবে।

—মানে ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

আর তিনি বললেন : মানে বুঝতে পারলেন না! পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ছিটে ফোঁটা প্রায় সর্বত্রই আছে, কিন্তু শহরটি হল নেত্রবতী নদীর তীরে। সেই নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

আমি বললাম : নদীর নামটি তো মিষ্টি!

রঙ্গরাজন বললেন : নদী একটি নয়। দুটি নদী ম্যাঙ্গালোরে —নেত্রবতী ও গুরপুর। এই দুই নদী মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। ম্যাঙ্গালোর শহর হল নদীর তীরে, আর সমুদ্র শহর থেকে অনেক দূরে।

জিজ্ঞাসা করলাম : বন্দর তা হলে কোথায়? সেও কি নদীর ধারে?

ভদ্রলোক বললেন : বন্দর দেখতে হলে বাসে চেপে যেতে হবে। মাইল ছয়েকের কম নয় সেই পথ।

সমুদ্রের দূরত্ব শুনে আমি বললাম : যাক, সমুদ্র তাহলে আছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন : সমুদ্র দেখার লোভ থাকলে কোড়িকোডে নামবেন।

—সে আবার কোথায়?

বলে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি সহাস্যে বললেন : ইংরেজী বানান কোঝিকোড, আর আপনারা বলেন কালিকট। পুরাকালে ভাস্কোডাগামা এসে যেখানে নেমেছিলেন, সেই বন্দর।

তারপরে বললেন : এই শহরের গায়েই হল সমুদ্র। স্টেশন থেকে একখানা অটোরিক্সায় চেপে সমুদ্রের ধারে বালির উপরে গিয়ে বসুন, সূর্যাস্ত দেখুন, আর দেখুন মানুষ জনের মেলা। সমুদ্র দেখবার শখ মিটবে সেখানে।

আমি বললাম : কালিকটে নামা কি সম্ভব হবে!

—কেন হবে না!

বলে ভদ্রলোক আমাকে বোঝালেন : কালিকট তো আর অন্য পথে নয়, ম্যাঙ্গালোরের পথেই কালিকট। এক ট্রেন থেকে নেমে আর এক ট্রেনে এগিয়ে যাবেন। ট্রেনের কোন অভাব নেই।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। এ যাত্রা আমার বেড়ানোর উদ্দেশ্য নয়, কাজ নিয়ে যাচ্ছি। কাজের পরে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই দেখব। তাড়াতাড়ি কাজ চুকে গেলে অবশ্য অন্য কথা।

ভদ্রলোক বললেন : আর একটা কাজ করতে পারেন। তাহলে আরও ভাল লাগবে আপনার।

—কী কাজ ?

—ম্যাড্রাস থেকে ম্যাঙ্গালোর মেল ধরবেন না, চলে যান ব্যাঙ্গালোরে। ব্যাঙ্গালোর থেকে বাসে চলে যান ম্যাঙ্গালোর। পথের শোভা দেখে মন ভরে যাবে।

আমি যখন আমার রিজার্ভেসনের কথা ভাবছিলাম, ভদ্রলোক তখন আমাকে সাহস দিয়ে বললেন : ভাববার কিছু নেই, বুঝলেন! ভোরবেলায় ম্যাড্রাস পৌঁছে ওপরতলায় ওয়েটিং রুমে চলে যাবেন, আর ব্রেকফাস্ট করবেন পাশের রিফ্রেসমেন্ট রুমে। তারপরে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ধরবেন। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস পেলে তো কথাই নেই, ও অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল ট্রেন। দিল্লীর যেমন তাজ এক্সপ্রেস, আর বম্বের ডেকান কুইন।

—তারপর ?

তারপর ব্যাঙ্গালোরের রিটায়ারিং রুমে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ম্যাঙ্গালোরের বাস ধরুন, কিংবা রাতের ট্রেনে মাইসোরে গিয়ে সকালের বাস। সন্ধ্যাবেলায় কেন, বিকালেই পৌঁছে যাবেন ম্যাঙ্গালোরে। ট্রেনে গেলেও আপনার এই সময় লাগবে।

বললাম : আমার যে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত রিজার্ভ করা আছে, ম্যাড্রাস থেকে রাতের মেলে!

ভদ্রলোক এবারে চিন্তিত হলেন। তারপর খানিকক্ষণ ভেবে বললেন : তাহলে এক কাজ করুন।

—বলুন।

—মেঙ্গে না গিয়ে সকাল বেলায় ওয়েস্ট কোস্ট এক্স্প্রেস ধরুন। সে ট্রেন ম্যাঙ্গালোরে বোধহয় সকালেই পৌঁছয়। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

—এ ট্রেন সময় মতো না পৌঁছলে কানেকসন মিস হতে পারে। এত দূরের যাত্রা, বুঝতেই পারছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল, পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরের দিকে মাদ্রাজ শহর, আর ম্যাঙ্গালোর পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে হবে। ট্রেন দক্ষিণে নেমে পশ্চিম প্রান্তের কোচিনের দিকে গেছে। তারপর মালাবার উপকূল ধরে উঠেছে উত্তরে। আর ব্যাঙ্গালোর হল দেশের মাঝখানে, মাঝপথে। ট্রেনে সেখানে গিয়ে, বাসে যেতে হয় ম্যাঙ্গালোর।

রঙ্গরাজন কিন্তু থামলেন না, বললেন: ব্যাঙ্গালোর থেকে ম্যাঙ্গালোর আর বেশি দিন বাসে যেতে হবে না। হাসান পর্যন্ত ছোট লাইন আছে, হাসান থেকে ম্যাঙ্গালোর লাইন পাতা হচ্ছে দ্রুত গতিতে। আর অল্প দিন পরেই ট্রেন চলবে। তখন ব্যাঙ্গালোরে রাতের গাড়িতে চেপে সকাল বেলায় ম্যাঙ্গালোর পৌঁছবেন।

দেশ দেখতে বেরোলে এ সব কথা শুনতে ভাল লাগে। আমি ভাবছিলাম আমার কাজের কথা। নির্দিষ্ট দিনে আমাকে পৌঁছতে হবে। তাই বললাম: এখন কোনও রিস্ক্ নেওয়া ঠিক হবে না।

—কেন?

—যানবাহনের গোলাযোগে পৌঁছতে দেরি হলেই কেলেঙ্কারি।

—ট্রেনেও তো দেরি হতে পারে!

—তার জন্যে আমি দায়ী হব না। দায়ী হবে ট্রেন। রেল কর্তৃপক্ষের উপরে দোষারোপ করে নিস্তার পেয়ে যাব।

ভদ্রলোক আমার কথা মেনে নিয়ে বললেন: হুঁ। চাকুরে লোক বলেই আমাদের চিন্তার ধারাটা এই রকম। নিজের কাজ হলে অন্য কথা ভাবতাম।

এই মন্তব্যের মধ্যে একটা খোঁচা আছে, কিন্তু কথাটা সত্যি বলেই তার যন্ত্রণা নেই। আর ভদ্রলোক যে কোন আঘাত দেবার জন্যে এ কথা বলেন নি, তা বুঝতে পারলাম তাঁর পরের কথায়। বললেন: তবে একটা কাজ করুন।

বললাম: বলুন।

—যেমন ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ভাবেই যান। বরং ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরতে পারলে তাই ধরুন। বিকেলের বদলে সকালে পৌঁছতে পারলে আপনার আরও সুবিধা হবে। কাজকর্ম হয়তো আগেই মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। তারপরে ফেরার পথে আসুন ব্যাঙ্গালোর হয়ে।

আমি বললাম: এ খুব ভাল পরামর্শ।

ভদ্রলোক পুলকিত হয়ে বললেন: পরামর্শ যে আমি ভাল দিই, এ কথা সবাই বলে। আর যদি একটা দিন আপনি বেশি খরচ করেন তো এমন পরামর্শ দিতে পারি যে আপনি লাফিয়ে উঠবেন।

ভদ্রলোকের দুর্বলতা আমি ধরে ফেলেছি, বললাম: সত্যি নাকি!

রঙ্গরাজন এবার তাঁর জুতো খুলে উপরে পা তুলে বসলেন। ওধারের বার্থে বসেছিলেন তিনজন, তাঁদের দুজন উপরের বাঙ্কের মালিক। এখন সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছেন। আর যিনি জানালার ধারে বসেছিলেন, তিনি চোখ বুঁজে বাইরের বাতাস উপভোগ করছেন। রঙ্গরাজন তাঁদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বললেন: আপনার ধর্মের টান বেশি, না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনি বেশি ভালবাসেন?

উত্তর দিতে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আর আমার এই দ্বিধা দেখে ভদ্রলোক যেন বেশি খুশী হলেন। বললেন: দুটোর কথাই আপনাকে বলছি।

আমি বললাম: সেই ভাল।

রঙ্গরাজন বললেন : আপনাদের আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকেই বেশি আকর্ষণ দেখেছি। বিশেষ ভাবে আপনার মতো একা মানুষের আমি তীর্থ যাত্রা করতে দেখি নি। আপনারা সস্ত্রীক তীর্থ করেন, তাই না?

এ কথা আমি মেনে নিতেই ভদ্রলোক বললেন : তবে আপনি সকালের প্রথম বাস ধরে ম্যাঙ্গালোর থেকে কুর্গের প্রধান শহর মার্কারায় চলে আসুন। আশি পঁচাশি মাইল পথ, সময় লাগবে ঘন্টা তিন চার। কেমন উঠ্‌তি পাহাড়ী শহর, দেখে ভাল লাগবে আপনার।

আমি বললাম : খুব চমৎকার আইডিয়া! এই সুযোগে কুর্গ দেখা না হলে জীবনে আর এ রকম সুযোগ আসবে না।

রঙ্গরাজন আরও উৎসাহিত হয়ে বললেন : কোডাভাদের দেশ এই কুর্গ। পাহাড়ীদেশ। পাহাড়ের গায়ে কফির চাষ, গোলমরিচ আর এলাচ। বড়লোক সব প্লাণ্টার, দুর্ধর্ষ সৈনিক। ভারতের প্রধান সেনাপতিরা এসেছেন এই দেশ থেকে। দীর্ঘ দিনের বৃটিশ শাসনেও এরা নিজেদের ঐতিহ্য হারায় নি।

মনে মনে আমি ঠিক করে ফেললাম যে সুযোগ পেলে কুর্গের উপর দিয়েই ফিরব। কিন্তু কিছু বলার আগেই রঙ্গরাজন বললেন : যদি পারেন তো তলাকাবেরী না দেখে ফিরবেন না।

তলা কাবেরী নাম আমি আগে শুনি নি। বললাম : এ কোন্‌ জায়গা?

রঙ্গরাজন বললেন : কাবেরী নদীর নাম নিশ্চয়ই জানেন?

বললাম : জানি।

রঙ্গরাজন বললেন : কাবেরীর উৎস হল তলা কাবেরীতে।

আরও কিছু শোনবার জন্য আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক আমার কৌতুহল লক্ষ্য করে বললেন : মার্কারা থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে ব্রহ্মগিরি পাহাড়। সেই পাহাড় থেকে কাবেরী

নেমেছে। খুব জনপ্রিয় তীর্থস্থান এটি। মার্কারা থেকে বাসেই যাতায়াত করা যায়। বোধহয় হাঁটতে হয় কিছু।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি বুঝি এই তীর্থের কথা বলছিলেন?

—না।

বলেই ভদ্রলোক পা নামালেন ব্যস্ত ভাবে। দরজার দিকে আমি চেয়ে দেখলাম যে একটি মেয়ে এসে দেখা দিয়েই সরে গেল।

—পরে কথা হবে।

বলে ভদ্রলোক তৎপর ভাবে বিদায় নিলেন।

আমি ভেবেছিলাম যে তিনি আবার ফিরে আসবেন। কিন্তু এলেন না। অনেক আগেই অন্ধকার নেমেছিল বাহিরে, ক্রমে সেই অন্ধকার গভীর হল। যাঁরা বই পড়ছিলেন, তাঁরা বই মুড়ে রাখলেন। যাঁদের সঙ্গে খাবার ছিল, তাঁরা খাবার খেয়ে নিলেন। খড়্গপুরে খাবার এল আমাদের। আমরাও খেয়ে নিলাম। তারপরে শোবার পালা। বাথরুম থেকে আসবার সময় আমি একবার রঙ্গরাজনের কামরার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সে কামরা তখন বন্ধ হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেও আমি রঙ্গরাজনের দেখা পেলাম না। ব্রেকফাস্টের পরে খবরের কাগজখানা আমার শেষ হয়ে গেল। বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে প্রসন্ন রৌদ্রে চারি দিক এখন ঝলমল করছে। আজ সারা দিন আমাকে এই গাড়িতেই কাটাতে হবে। আমার সঙ্গীরা সবাই স্বপ্নভাবী। আজ তাঁরা অল্পক্ষণের জন্য বই খুলেছিলেন। তারপরে উপরে উঠে আবার শুয়ে পড়েছেন। শুয়ে সময় কাটানোই সব চেয়ে সহজ মনে হয়েছে তাঁদের।

কিন্তু এ সময়ে আমার শোবার ইচ্ছা হল না। পলাসায় চা খেয়েছি। বিজয়নগরমে প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিকক্ষণ পায়চারি করলাম। ওয়ালটেয়ারে লাঞ্চ পাওয়া যাবে। তার আগে স্নান করে নেব,

খেয়ে দেয়ে ঘুম। রাজমন্দ্রীতে চোখ মেলে চা খাব, তারপরে বিজয়ওয়াড়ার বিরিয়ানি খেয়ে আবার ঘুম। এ সময়টায় রঙ্গরাজনকে পেলে গল্প করে খানিকটা সময় কাটানো যেত।

কিন্তু ভদ্রলোককে আজ একবারও দেখতে পাই নি। বেশ খানিকটা আশ্চর্য হয়েছি। কাল নিজে থেকে এসে জমিয়ে গল্প শুরু করেছিলেন। শেষ হবার আগে উঠে গিয়েছিলেন মেয়ের ডাকে। এমন কী ঘটে থাকতে পারে যে তারপর থেকে তাঁর আর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না!

বিজয়নগরম থেকে ট্রেন ছাড়বার পরে আমি তাঁদের কামরার দিকে একবার মুখ বাড়ালাম। ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন, আর তার স্ত্রী বোধহয় স্নান করতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। ভদ্রলোক এমন নির্বিকার যে আমাকে যেন দেখতেই পেলেন না।

নিজের কামরায় ফিরে এসে আমি তাঁর কথাই ভাবছিলাম। সহসা ভদ্রলোক এমন বদলে গেলেন কেন! আমারই কি ত্রুটি হয়েছে! কাল তো নিজেই এসেছিলেন গল্প করতে! আজ আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না!

কিন্তু বেশিক্ষণ এ সব কথা ভাববার সময় পেলাম না। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ভদ্রলোক এসে আমাদের কামরায় ঢুকলেন, বললেন: কাল একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন: ম্যাঙ্গালোর থেকে যদি আপনি হাসান হয়ে ফেরেন তো একটি দিন আপনাকে হাসানে থাকতেই হবে। এক বাস থেকে নেমে আর এক বাস ধরলে চলবে না। থ্রু বাসে চেপে হাসানের উপর দিয়ে চলে আসাও আমি সমর্থন করব না।

ভদ্রলোক যে এতক্ষণ আমার ভ্রমণের কথাই ভাবছিলেন, এ কথা জেনেই আমি বেশি আশ্চর্য হলাম। হাসানে কেন নামতে হবে, সে সম্বন্ধে আমার কৌতূহল খুবই কম ছিল। কিন্তু রঙ্গরাজন আমার

কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে বললেন : হাসানের কাছাকাছি দুটি এমন সুন্দর মন্দির আছে যে তা দেখে না এলে আপনার দক্ষিণভারতে আসা ব্যর্থ হয়েছে মনে হবে।

ভদ্রলোককে আমি আমার পাশে বসবার জায়গা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ তিনি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন : বেলুর আর হালেবিড—হয়শাল রাজাদের তৈরি এই দুটি মন্দিরের তুলনা সারা ভারতে বোধহয় নেই। অথচ এ দুটি মন্দির দেখতে আপনার কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। হাসান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এই মন্দির দুটি দেখে আসতে আপনার এক বেলা সময় লাগবে। আর পুরো দিনটা পেলে শ্রবণ বেলগোলাও দেখে আসতে পারবেন। শ্রবণ বেলগোলার নাম শুনেছেন তো ?

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক বললেন : ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় গোমতেশ্বরের জৈন মূর্তি। একটা পাথর থেকে কেটে বার করা এত বড় মূর্তি নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

বলে ভদ্রলোক নিজের কামরার দিকে একবার তাকালেন।

বললাম : এত সময় হাতে থাকবে কি !

রঙ্গরাজন তখনই উত্তর দিলেন : তাহলে এক কাজ করবেন। মার্কারা থেকে মাইসোর হয়ে ফিরবেন। মাইসোরের কাছে—মানে মাইল কুড়ি বাইশ দূরে সোমনাথপুরে আছে হয়শাল রাজাদের আর একটি মন্দির। এটি দেখে এলেও আপনার একটা ধারণা হয়ে যাবে।

আমি বললাম : দাঁড়িয়ে রইলেন কেন !

রঙ্গরাজন এ কথার উত্তর না দিয়ে নিজের কামরার দিকে আর একবার তাকিয়ে বললেন : আর একটা কথাও এই সময়ে বলে রাখি।

—বলুন।

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে সাগ্রহে তাকালাম।

তিনি বললেন : ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত গিয়ে উডিপি না দেখে ফিরবেন না। এ রকমের সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। উডিপি জানেন তো !

উডিপি নামটা শোনা মনে হচ্ছিল, কিন্তু কী প্রসঙ্গে শুনেছিলাম তা মনে পড়বার আগেই ভদ্রলোক বললেন : উডিপি হল মাধবাচার্য স্বামীর সাধনার স্থল। কৃষ্ণের মন্দির আছে। খুবই বড় তীর্থ। ম্যাঙ্গালোর থেকে বাসে যেতে হয় উত্তরে। ট্রেন যায় না।

চৈতন্য দেবের তীর্থ পরিক্রমায় বোধহয় উডিপির কথা শুনেছি। উড়ুপ কৃষ্ণের কথা। কিন্তু সে এই তীর্থ কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁকে কোন প্রশ্ন করবার আগেই তিনি আমাকেই প্রশ্ন করলেন : মুদ্‌বিদ্‌রির নাম শুনেছেন ? কর্কল তার ভেনুরের নাম ?

আমি সত্যি কথাই বললাম : না।

ভদ্রলোক বললেন : একটু কষ্ট করে ও ছুটো জায়গাও দেখে আসবেন। ও দিকেও যে শ্রবণবেলগোলার মতো বিরাট জৈন মূর্তি আছে, সে কথা অনেকেই জানে না।

আমি বললাম : আপনি দেখছি অনেক জায়গা দেখেছেন !

ভদ্রলোকের ছু চোখ চকচক করে উঠেই সহসা নিবে গেল। একটু বিমর্ষ ভাবে বললেন : অনেক জায়গা আর দেখলাম কোথায় !

বলতে বলতেই দরজার কাছ থেকে সরে গেলেন।

একটা অদম্য কৌতূহলে আমি উঠে দরজার কাছে চলে এলাম। কিন্তু ভদ্রলোককে আর দেখতে পেলাম না। তার বদলে তাঁর স্ত্রীকে দেখলাম স্নান করে বাথরূম থেকে বেরিয়ে আসতে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলাম।

ওয়ালটেয়ারে নতুন স্টেশন হয়েছে। সীমাচালমের পরে ওয়ালটেয়ার স্টেশন, কিন্তু পাহাড়ের উপরে নৃসিংহ দেবের মন্দির দেখতে পাই নি। তেমনি ওয়ালটেয়ার শহরটি সমুদ্রের ধারে, কিন্তু

ট্রেন থেকে সমুদ্র দেখতে পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরে শুয়ে পড়লাম। দুপুরের আহারের পরে ঘুমটা ভাল হল।

বিকালে চায়ের অর্ডার দেওয়া ছিল। রাজমন্দ্রীতে চা পাওয়া গেল। তারপরে গোদাবরী নদীর পুল পেরোলাম। এত বড় রেলের পুল এ দেশে নাকি আর একটি আছে—সেটি ডেহ্‌রি অন-শোনে শোন নদীর পুল। দিল্লী যাতায়াতের পথে সে পুল আমরা অনেক রাতে পেরোই বলে দেখতে পাই নে।

তারপর একটু একটু করে অন্ধকার নামল। রঙ্গরাজন আর আমাদের কামরায় এলেন না।

বিজয়ওয়াড়ায় খাবার পরে আর একবার দেখা হল রঙ্গরাজনের সঙ্গে। বাথরুম থেকে তিনি যখন বার হচ্ছিলেন, আমি তখন দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, বললাম: সারা দিন আপনি ব্যস্ত ছিলেন, তা না হলে আপনার কাছে আরও অনেক খবর পাওয়া যেত।

ভদ্রলোক যেন দুঃখ পেলেন আমার কথায়। বড় কাতর দেখাল তাঁর দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করলেন: কবে ফিরছেন আপনি?

তারিখটা আমি জানালাম। ম্যাড্রাস থেকে ফেরার রিজার্ভেসনের জন্যে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

ভদ্রলোক এক মুহূর্তে পুলকিত হয়ে উঠলেন, বললেন: তবে ঠিক আছে।

—কেন বলুন তো!

—আমরাও ঐ দিনেই ফিরব।

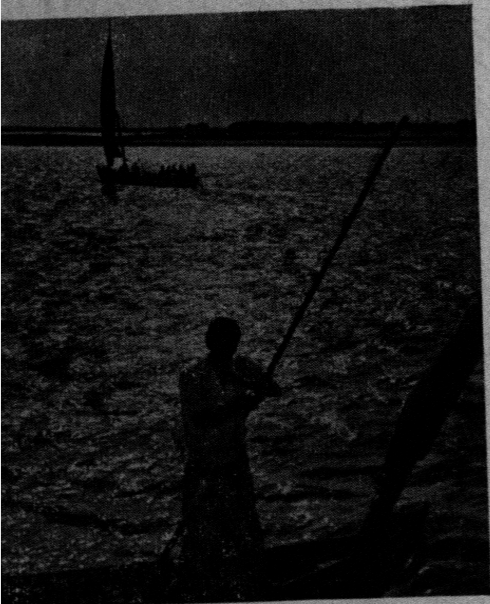
—দেশে থাকবেন না কিছু দিন?

তিনি বললেন: দেশে যাচ্ছি না তো, যাচ্ছি তিরুপতি। মেয়ে বড় হয়েছে। ভাল একটা বিয়ে দিতে হবে। ভেঙ্কটেশ্বরের পায়ে প্রণাম জানিয়ে আসব।

বলে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। ত্বরিত পদে নিজের কামরার দিকে চলে গেলেন।

রঙ্গরাজনের সঙ্গে যে কাল আর দেখা হবে না, আমি তা জানতাম। মাঝরাতে গুডুরে গাড়ি বদল করে তাঁরা তিরুপতি যাবেন। আর ভোরবেলায় আমরা পৌঁছব ম্যাড্রাসে। ফেরার পথে আবার দেখা হবে কিনা কে জানে।

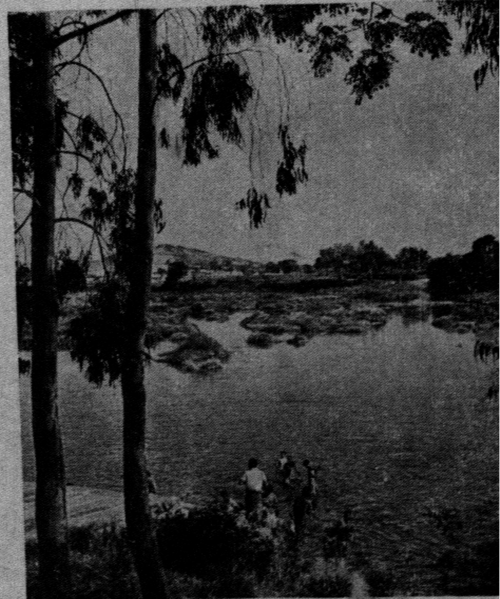
বড় রহস্যময় মনে হল এই ভদ্রলোকের আচরণ! আলাপ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েও যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন! আবার দেখা হলে সকলের আগে তাঁর কাছে এই কথাটিই জেনে নেব।



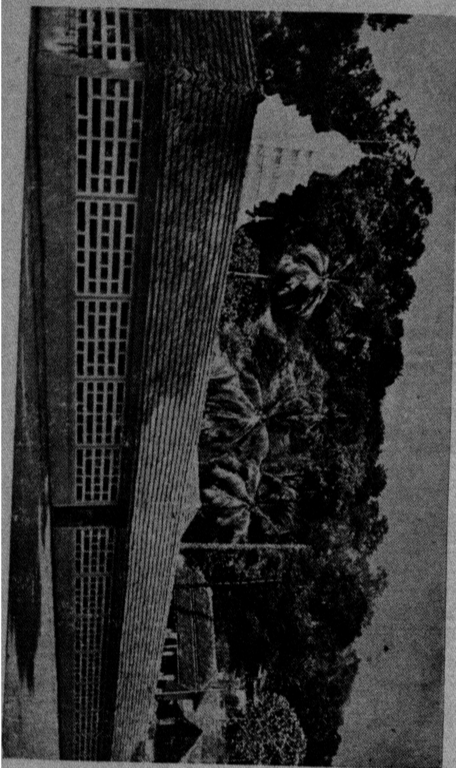
ম্যাঙ্গালোরের নেত্রবতী নদী



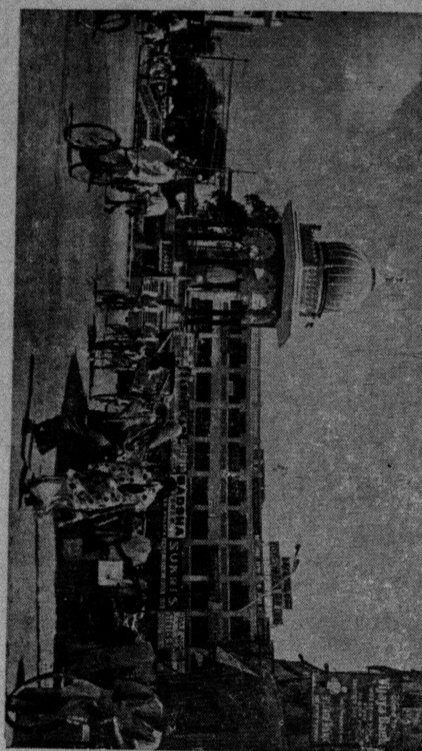
মাটির জোড়া হাতী



শ্রীরঙ্গপত্তনে কাবেরী সঙ্গম



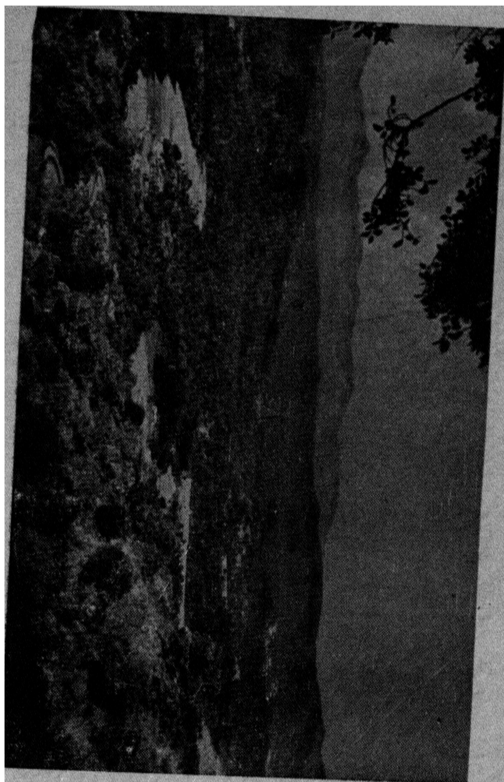
ম্যাঙ্গালোরের মন্দির



মাইসোরের রাজপথ



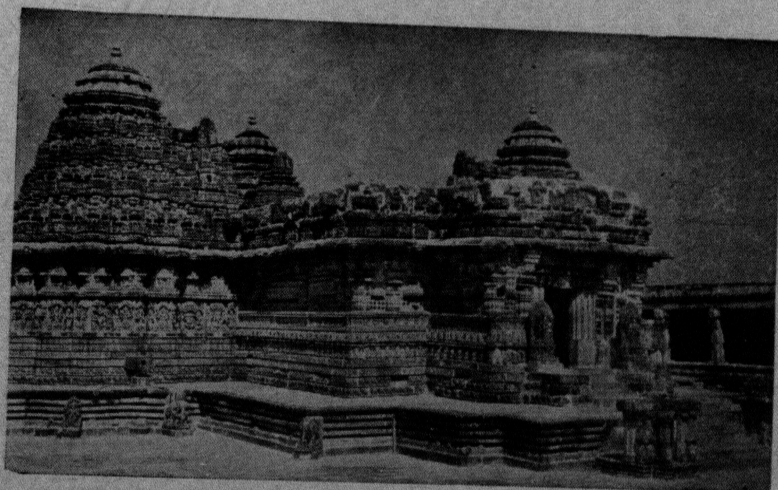
টিপু সুলতানের সমাধি



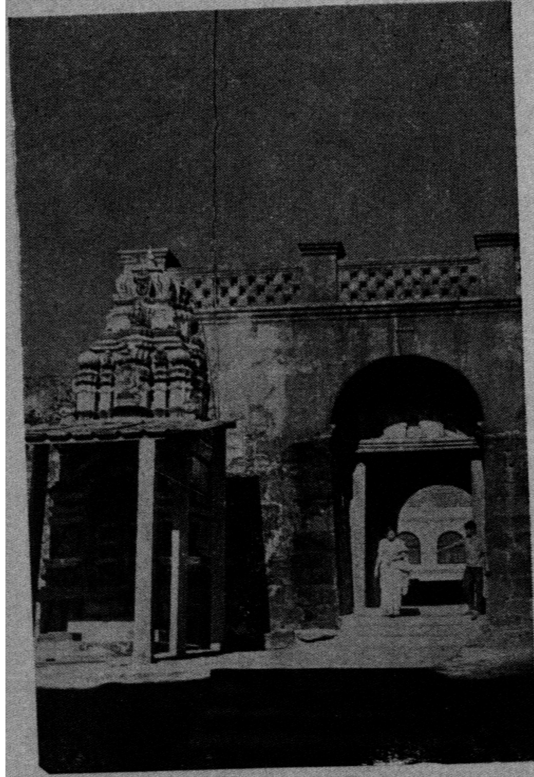
মার্কারা থেকে নীচের দৃশ্য



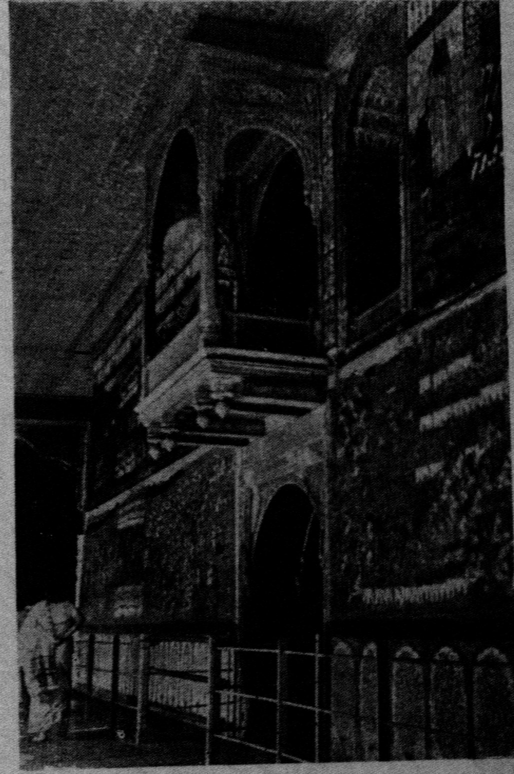
মাদ্রাজের সমুদ্র বেলা



সোমনাথপুরমের মন্দির



কুর্গের দুর্গ দ্বার



টিপু সুলতানের প্রাসাদ

ভোরবেলায় প্রায় সময় মতোই আমরা ম্যাড্রাসে পৌঁছলাম। রঙ্গরাজনের পরামর্শ আমার মনে ছিল। তাই ম্যাড্রাস মেল থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমেই কুলিকে বললাম: ওয়েটিংরুম।

রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক দলাদলি আছে। ভাষা ও সমাজেও বিরোধের অন্ত নেই। কিন্তু ভরসার কথা যে ভারতীয় রেলে ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই এক রকম। স্টেশনের কুলিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গাইড। আর ট্রেন স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েটিং রুম রিটায়ারিং রুম রিফ্রেশমেণ্ট রুম ক্লোকরুম বুকিং অফিস রিজার্ভেসন অফিস প্রভৃতি কথাগুলি সর্বভারতীয় কথায় পরিণত হয়েছে। এ সব যদি রাষ্ট্রভাষায় বলতে হত, কিংবা স্থানীয় ভাষায়, তাহলে এই দক্ষিণ ভারতে আমাদের কী দশা হত জানি নে। রেলকর্তৃপক্ষ এই শব্দগুলি বিতাড়নের জন্যে কিছু চেষ্টা করেছিলেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি বলে জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। কুলি আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে এগিয়ে চলল। আর আমি এক লজ্জাশীলা বধূর মতো নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম।

ফার্স্ট ক্লাশ থেকে নেমেছিলাম বলে কুলি আমাকে উপরতলার ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমেই নিয়ে এল। প্ল্যাটফর্মের শেষে থ্রু টিকিট দেখিয়ে দোতলায় উঠলাম। এক দিকে রিফ্রেশমেণ্ট রুম, অন্য ধারে এক সারি রিটায়ারিং রুম। রাত্রিবাস করব না বলে রিটায়ারিং রুমের প্রয়োজন আমার নেই। ওয়েটিং রুমেই স্নান করে রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপরে বারান্দায় অপেক্ষারত এক কুলিকে ধরে বললাম: ক্লোক রুম।

আর কিছু বলবার দরকার নেই, বোঝাবারও প্রয়োজন নেই। সে বুঝে নিয়েছে যে মালপত্র সেখানে জমা রেখে বেড়াতে যাব।

ওয়েটিং রুমে মালপত্র রেখে যাওয়া খুব নিরাপদ নয়। কখন কে এসে কার জিনিস নিয়ে যায়, তার ঠিক নেই। তারপরে আফশোস করে কোন ফল নেই। রেল কর্তৃপক্ষের যে কোনও দায়-দায়ীত্ব নেই, তা সর্বত্রই লেখা আছে। কাজেই ক্লোক রুমে জমা দেওয়াই সব দিক থেকে নিরাপদ। কিন্তু এর কায়দা-কানুন শিখে রাখবেন। স্যুটকেশের গায়ে চাবি দিলেই চলবে না, গা-তালা ঝোলাতে হবে। আবার অনেক জায়গায় দু দিকে তালা ঝোলাতে বলবে। তখন 'আইন দেখাও' বলে ঝগড়া করবেন না। এ কালের লোকে ঝগড়ায় অনেক বেশি দক্ষ। ঝগড়ায় হেরে গেলে নিজের আনন্দই নষ্ট হবে, তার কোন ক্ষতি হবে না। তার চেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কাজ হাসিল করে নেবেন। আর নতুন হোল্ডল কেনার সময় এই তালার কথাটি মনে রাখবেন। তালা ঝোলাবার ব্যবস্থা না থাকলে হোল্ডলটি জমা দিতে পারবেন না। অনেক দিনের অভ্যাসে ভ্রমণের কায়দা-কানুন বেশ রপ্ত করে ফেলেছি। তাই একা বেড়াতে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় না। নির্বিঘ্নে মালপত্র জমা দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম।

রিজার্ভেসন অফিস প্ল্যাটফর্মের বাহিরে। সবে খুলেছে। কর্মীদের মন মেজাজ মনে হল ভাল। তাই সাহস করে এগিয়ে গেলাম। বড় বিচিত্র এই জায়গা। হ্যাঁ-কে না এবং না-কে হ্যাঁ বলতে এরা অভ্যস্ত বলে অনেক অভিযোগ শুনেছি। কোনও রেলের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর বন্ধুর জন্যে ব্যবস্থা করতে পারেন নি, কিন্তু সেই বন্ধু ব্যবস্থা করেছেন দালালের মাধ্যমে। কড়া তদন্ত হয়েছিল শুনেছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নি, কারও দোষ ধরা পড়ে নি। এখানে অনায়াসেই আমার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এ দিকে বোধহয় ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী কম, কিংবা আমার ভাগ্যই ভাল। ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসে রিজার্ভেসন পাবার পরে ম্যাঙ্গালোর মেলে রিজার্ভেসন কাটিয়ে

দিলাম। ম্যাড্রাস থেকে ফেরার রিজার্ভেসনও দেখে নিলাম অন্য কাউণ্টারে। নিশ্চিন্ত হলাম।

দুপুর একটায় ট্রেন ছাড়বে। ঘণ্টা কয়েক সময় আছে হাতে। অথচ স্টেশনে আর কোন কাজ নেই। শহর দেখাই কাজ। আর সময় মতো ফিরে দুপুরের আহার সেরে ট্রেন ধরা। কিন্তু কী দেখব শহরে! ট্রেনে সহযাত্রীদের সঙ্গে আমার সামান্য কথাবার্তা হয়েছে। শহরের দ্রষ্টব্য স্থানের কথা কারও কাছেই জেনে নিতে পারি নি। রিফ্রেশমেণ্ট রুমেও একটা খালি টেবিলে বসেছিলাম। আশেপাশে আর কেউ ছিলেন না যে জিজ্ঞাসা করে কিছু জেনে নিতে পারতাম।

কিন্তু তার জন্যে অসুবিধা নেই। স্টেশনে বিভিন্ন রকমের বই-এর দোকান আছে। সেখান থেকে একখানা চটি গাইড বই সংগ্রহ করে নিলাম। শহরের নক্সা আছে শেষ পাতায়, সেটির উপরে চোখ বুলিয়েই মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলাম।

শহরের পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর। ছোট দুটি নদী এঁকেবেঁকে এই সমুদ্রে এসে পড়েছে। শহরের ঠিক মাঝখানে কয়ুম নদী, আর দক্ষিণে অ্যাডিয়ার নদী। রেলওয়ে স্টেশনও দুটি—ম্যাড্রাস সেণ্ট্রাল বড় লাইনের স্টেশন, আর খানিকটা তফাতে ছোট লাইনের এগমোর স্টেশন। কিন্তু রেললাইন এগমোরেই শেষ হয় নি, শহরের মাঝখান দিয়ে উত্তরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পৌঁছেছে। শুনেছি কলকাতার মতো ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন চলে এই লাইনে—সমুদ্রের ধার পর্যন্ত কয়েকটা স্টেশন আছে শহরে।

কিন্তু এই অল্প সময়ে কোথায় যাই আর কী দেখি, তাই ভাবতে ভাবতেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। ভারি পরিচ্ছন্ন চারি দিক। স্টেশনের সামনেই চওড়া রাস্তা রেললাইনের সমান্তরাল চলেছে। ওধারের ফুটপাথে বাসের যাত্রীরা অপেক্ষা করছে। রাস্তা পেরিয়ে আমিও সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এ রকমের পরিবেশ মন্দ লাগে না। বেশ অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস মনে হয়। আর জানবার আগ্রহ থাকলে কত তাড়াতাড়ি জানা যায়, তাই দেখে নিজেকেই আশ্চর্য হতে হয়। বাসের জন্য যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন তাঁদেরই একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোথায় যাবেন আপনি?

ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিলাম। ভদ্রলোক সংক্ষেপে উত্তর দিলেন: ট্রিপ্লিকেন।

তারপরে এক নজরে আমাকে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন: আপনি?

শহরের নক্সায় ট্রিপ্লিকেন নামটা আমি দেখেছিলাম। সমুদ্রের ধারে একটা পাড়া বলে মনে হয়েছিল। তাই কোন ইতস্তত না করেই বললাম: আমিও ঐ দিকেই যাব।

বাসের জন্যে এখানে যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না, তা দেখে ভারি আশ্চর্য হলাম। ভদ্রলোক বললেন: তাহলে চলে আসুন।

বলতে না বলতেই বাস এসে দাঁড়াল। আর কয়েকজন যাত্রী নেমে পড়তেই আমরা উঠে পাশাপাশি বসে পড়লাম।

স্থির হয়ে বসেই ভদ্রলোক আমার হাতের গাইড বইখানা দেখতে পেলেন। বললেন: আপনি কি এখানে নতুন এসেছেন?

বললাম: এই প্রথম।

—চেনেন না কিছু?

—না।

—তবে ট্রিপ্লিকেনে যাচ্ছেন কেন?

—সমুদ্র দেখতে।

—চলুন, আমিও সমুদ্রের ধারে যাব।

খুশী হয়ে আমি বললাম: তবে তো ভালই হল। আপনার কাছেই শহরের পরিচয় পাব।

বাস চলতে শুরু করেছিল। পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ঐ বাড়িগুলো চেনেন?

বললাম: না।

ভদ্রলোক বললেন: স্টেশনের ওপাশে রেলের দপ্তর, আর এপাশে জেনারেল হস্‌পিটাল। ঐ রাস্তা ধরেও সমুদ্রের ধারে যাওয়া যায়।

বলে বাঁ হাতের একটা রাস্তা দেখালেন। তারপরে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন: এই হোটেলে আপনার পছন্দ মতো খানা পাবেন।

বলে পথের বাঁধারের একটা হোটেল দেখালেন, আর ডান ধারে হাত দেখিয়ে বললেন: এই হল মুওর মার্কেট। এর পিছনেই পিপ্‌ল্‌স্ পার্ক—ম্যাড্রাসের চিড়িয়াখানা দেখতে পাবেন ভিতরে।

বাস তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। বাড়ি ঘরের হিসাব আর রাখা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক বললেন: এই অঞ্চলেই স্কুল অব আর্টস্, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি ও গভর্নমেণ্ট মিউজিয়ম। মাউণ্ট রোডের নাম শুনেছেন?

বললাম: না।

—কলকাতার চৌরঙ্গীর মতো অভিজাত পথ। সেও এই অঞ্চলে। চীনাবাজার স্টেশনের অন্য ধারে। সে দিকে গেলে ফোর্ট হাইকোর্ট লাইট হাউস আর হারবার দেখতে পেতেন। আর সে দিক থেকেও মেরিনা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ট্রিপ্লিকেনে আসতে পারতেন।

কয়ুম নদী কবার পার হলাম বলতে পারব না। কোন পথ দিয়ে শহর পেরিয়ে যে সমুদ্রের ধারে এলাম, তাও বুঝতে পারলাম না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারলাম যে দূরত্ব খুব বেশি নয়, আর পথে যানবাহন চলাচল করে দুরন্ত বেগে। ভদ্রলোকের সঙ্গেই আমি নেমে পড়লাম, আর এগিয়ে গেলাম সমুদ্রের দিকে।

ভদ্রলোক বললেন: আপনি কি বীচের উপর দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাবেন?

—আপনি?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন : আমি পার্থসারথির মন্দিরে যাব।

বললাম : তবে আমিও মন্দিরটা আগে দেখে আসি।

—আসুন।

বলে তিনি এগিয়ে চললেন। আর আমি অনুসরণ করলাম তাঁকে।

পার্থসারথির মন্দিরটি বড় প্রাচীন। কিন্তু মনে রাখবার মতো কোন জাঁকজমক দেখতে পেলাম না। মন্দিরের সংলগ্ন একটি সরোবরও নাকি আছে, কিন্তু সে দিকে যাবার সুযোগ হল না। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক বাইরেই চটি খুলে রাখলেন। পরনে ছিল লুঙ্গির মতো দু ভাঁজ করা সাদা ধুতি। তার জরির পাড়। গায়ে একটা জামার ওপর পাট করা চাদর। দেবতার দর্শন করে যখন তিনি বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর কপালে তিলক দেখতে পেলাম। বুঝতে অসুবিধা হল না যে তিনি বৈষ্ণব। ভদ্রলোক এবারে হনহন করে বেরিয়ে এলেন। চটির ভিতর পা গলিয়ে বললেন : এবারে আপনি কোথায় যাবেন ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি ?

ভদ্রলোক বললেন : আমার কলেজের সময় হয়ে গেছে।

তারপরে ছুটতে ছুটতেই বললেন : মোড়ের উপরেই আমার কলেজ—প্রেসিডেন্সী কলেজ। মেরিনা ধরে যদি উত্তরে হাঁটেন তো প্রথমে চীপক প্যালেস, তারপরে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ও সিনেট হাউস দেখতে পাবেন। হাঁটতে হাঁটতে কয়ুম নদীর উপরে নেপিয়ার ব্রিজ পেরিয়ে ফোর্টে পৌঁছে যাবেন। আর তা না হলে এইখান থেকে একটা বাস ধরে চলে যান মায়লাপুরের শিব মন্দিরে। পথে স্যানটোম গির্জা দেখতে পাবেন। আর সময় থাকলে অ্যাডিয়ারে গিয়ে থিওসফিকাল সোসাইটিও দেখে আসতে পারেন।

কলেজের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক বললেন : আপনার হাতে ঘড়ি আছে ?

বললাম : আছে।

—কত সময় হয়েছে বলুনতো।

সময়টা বললাম।

—তাই নাকি!

বলে ভদ্রলোক খুশী হয়ে উঠলেন, আর চলার গতি দিলেন কমিয়ে। বললেন : তবে তো আপনার সঙ্গে আরও দু একটা কথা হতে পারে।

আমিও খুশী হয়ে ভাবলাম যে আরও কিছু দ্রষ্টব্য স্থানের কথা বোধহয় বলবেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি তো বাঙালী, তাই না?

বললাম : হ্যাঁ।

—আচ্ছা বলুন তো, বাঙলার ছাত্ররা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল কেন? কী জন্যে মার-মুখো হয়ে উঠেছিল, আর কী পেয়ে শান্ত হয়ে গেল?

সত্যি বলতে কি, এ কথা আমি কোন দিন ভেবে দেখি নি। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভারি অস্বস্তি বোধ করলাম। আর উত্তরটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম : আমি পাটনায় থাকি বলে ব্যাপারটা ঠিক জানি নে।

ভদ্রলোক বললেন : আপনার কি মনে হয় নি, কোন রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ছাত্রদের পরিচালনা করতে চেয়েছিল!

—কী প্রয়োজনে?

—দেশে একটা অরাজক অবস্থা জাগিয়ে রাখবার জন্যে! দেশের সরকারের উপরে জনগণের অবস্থা বিলোপ করবার জন্যে!

—তাই কি!

—আমার মনে হয় যে ছাত্ররা এ কথা বুঝতে পেরেই পিছিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন তাদের মুক্তি আনবে না, তাদের মুক্তি আসবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন : আর সরকারও এই ছাত্রদের সমস্যা পরিপূর্ণ সহানুভূতি নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করলে দেশগড়ার কাজ ত্বরান্বিত হবে, তাই না ?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

এ সব কথা ভেবে দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তাই উত্তর দিলাম : হয়তো তাই।

তখন আমরা কলেজের গেটে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ভিতরে লোকজন দেখে ভদ্রলোক আবার অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন : ভাল করে আপনার সঙ্গে কোন কথাই হল না।

বলতে বলতেই ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

পথের উপরে আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম।

মোড়ের উপরেই একটি সুন্দর স্ট্যাচু। তারপরেই বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। সকালের রৌদ্র তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। লোকজন বেশি নেই। দূরে জলের ধারে কয়েকটি নিচু নিচু তালপাতার কুঁড়ে ঘর দেখা যাচ্ছে। নীল সমুদ্র তার পিছনে। ঢেউ আসছে। ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আমার মনে হল যে বালির উপর দিয়ে হেঁটে জলের ধারে যেতে হলে আর কোথাও যাওয়া হবে না। তার চেয়ে আর কোথাও যাওয়া ভাল।

ঠিক এই সময় একজন একখানা অটো রিক্সা থেকে আমার কাছাকাছি নেমে পড়লেন। একটু তৎপর ভাবে এগিয়ে গিয়ে আমি রিক্সাটা ধরে ফেললাম। বললাম : মায়লাপুরের মন্দির।

যিনি নেমেছিলেন তিনি পয়সা মিটিয়ে দিতেই রিক্সা এগিয়ে চলল দক্ষিণের দিকে। সুযোগ পেয়ে আমি আমার নক্সাটা খুলে দেখলাম। প্রথমে স্যানটোম ক্যাথিড্রাল পাব, তারপরে শহরের মধ্যে মন্দির. ক্যাথিড্রালের সংক্ষিপ্ত বিবরণও আছে বই-এ।

রোমান ক্যাথলিকদের খুব প্রাচীন গির্জা, প্রায় দু হাজার বছরের পুরনো। যীশুখৃষ্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস একটি ছোট গির্জা তৈরি করেন। সাড়ে চার শো বছর আগে ওলন্দাজরা তার সংস্কার করে। আর গত শতাব্দীতে এটি একেবারে নতুন করে তৈরি হয়েছে।

সমুদ্রের ধারের সুদীর্ঘ পথ মেরিনা এইখানেই শেষ হয়েছে। এর দক্ষিণে অ্যাডিয়ার পর্যন্ত সমুদ্রের ধারে কোন রাজপথ নেই। মায়লাপুর মন্দিরে গেলাম ডান দিকের পথ ধরে। একটা উঁচু গোপুরমের সামনে আমাকে নামতে হল।

গোপুরম কথাটি এইখানেই প্রথম শুনলাম, আর দেখলামও প্রথম। গোপুরম হল মন্দিরের গেট—অপরূপ কারুকার্যময় একটি শিখর যেন আকাশের দিকে উঠেছে।

প্রথমে আমি একেই মন্দির ভেবেছিলাম। কিন্তু নিচের উন্মুক্ত দরজা দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত করতে দেখে বুঝলাম যে এর নিচে দেবতার গর্ভগৃহ নেই। সামনে কোন দরজাও নেই। প্রাচীর বেষ্টিত মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ এই উন্মুক্ত গোপুরমের নিচে দিয়ে।

সরাসরি আমি ভিতরে যেতে পারলাম না। গোপুরমের গায়ে কারুকার্য দেখতেই আমার অনেক সময় লেগে গেল। বুঝতে পারলাম যে নানা পৌরানিক কাহিনী এই গোপুরমের গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে। এই স্থাপত্য কর্মের যেন তুলনা নেই।

কিন্তু ভিতরের মন্দির দেখে বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। মন্দিরকে মন্দির বলেই মনে হল না। গোলগোল থামওয়ালা একটা চারকোনা অন্ধকার ঘর। একতলা বাড়ীর মতো তার সমতল ছাদ। নিতান্ত সাদাসিধে পরিবেশের মধ্যে আছেন কপালীশ্বর শিব।

এ বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। বাহিরের স্থাপত্য দেখে মুগ্ধ হবার পর ভিতরে এসে দেবতাকে দেখছি অন্ধকার ঘরে। তাও দূর থেকে। চোখ বুঁজে তাঁর রূপ দেখে মন ভরে নিতে হবে।

মন্দিরের পিছনে আছে বিরাট পুকুর। তার চারিধারে বাঁধানো সিঁড়ি। যাত্রীরা ঘাটে স্নান করে দেবতাকে দর্শন করতে আসছে। আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। খালি পায়ে মেয়ে পুরুষেরা আসা যাওয়া করছে। নিতান্ত সাধারণ তাদের বেশ বাস। গাঢ় রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে অনেক বয়স্ক মহিলা, তার জমকালো জরির পাড়। কিন্তু বাড়িতে কাচা শাড়ি এমন ভাবে পরেছে যে কাউকেই মনে হচ্ছে না সেজে এসেছে। এরা যেন শান্তিপুরের শাড়ির বদলে কাঞ্চিপুরের শাড়ি পরতেই অভ্যস্ত। এই জরির পাড়ের দামী সিল্কের শাড়িই যেন এদের আটপৌরে শাড়ি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কেউ জটলা করছে না, পাণ্ডা ধরছে না। ভিড়ও নেই কোন খানে। নিঃশব্দে শিবের দর্শন করে, চারি দিকের ছোট ছোট মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীদের প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। পরিক্রমার এমন একটি রীতি দেখলাম যে যাত্রীরা মুখোমুখি হচ্ছে শুধু পুকুরের ঘাটে। যারা স্নান করছে না, তারা হাত-পা ধুতে আসছে পুকুরের ঘাটে।

পুরুষদের কপালে আমি ফোঁটা তিলক দেখলাম। কিন্তু পার্থসারথির মন্দিরে যেমন দেখেছি, এখানে তেমন নয়। এঁরা সারা কপাল জুড়ে লাইন টেনেছেন তিন সারি। শৈব এঁরা। আমার মনে হল যে এঁরা রোজ মন্দিরে আসেন, দেবতাকে প্রণাম না জানিয়ে দিনের কাজ শুরু করেন না।

হঠাৎ একজন ব্রাহ্মণ আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কোনও ব্রাহ্মণ খুঁজছেন ?

ভদ্রলোক ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিলেন। আর আমি ভেবেছিলাম যে ইনি বোধ হয় এ দেশের পাণ্ডা, উত্তর ভারতের যাত্রীর প্রয়োজনে ইংরেজী শিখেছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি বললাম : না।

তাঁর পরণে ধুতির লুঙ্গি। আধাআধি ভাঁজ করে উপরে তুলে কোমরে গুঁজেছেন। খালি গায়ে একখানা চাদর, আর কপালে চন্দনের প্রলেপ। তাঁর গলায় মোটা উপবীত আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম। তবু তিনি বললেন : আমি ব্রাহ্মণ, আপনার যদি কোন সাহায্যের দরকার থাকে তো স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

আমি এবারে একটু বিরক্ত স্বরে বললাম : না, ব্রাহ্মণের আমার দরকার নেই।

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলে ফিরে গেলেন।

কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আমি আশ্চর্য হলাম। তাঁকে দেখে অনেকেই বেশ সমীহ করে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কেন তা বুঝতে না পেরে আমি দ্রুত পায়ে মন্দিরের গোপুরমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গোপুরমের নিচে এসে আমি দেখলাম যে তিনি একখানা বিরাট বিদেশী গাড়িতে উঠলেন। উর্দিপরা একজন ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল। তিনি উঠে বসবার পরে দরজা বন্ধ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল যে তামিলনাড়ুর মানুষের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় হল।

রঙ্গরাজনকে এখন আমার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে। ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন। ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ছাড়ার সঠিক সময় বলতে না পারলেও পৌঁছবার সময়টা ঠিকই ভোরবেলাতেই। ম্যাঙ্গালোর মেলে গেলে দিনটা গাড়িতে কাটত। একটা দিন আমার বেঁচে যাবে। মাদ্রাজে দুপুরের আহার সেরে আমি ট্রেন ধরলাম।

না। এ গাড়িতে আমি রঙ্গরাজনের মতো সহযাত্রী পেলাম না। এক বৃদ্ধ দম্পতি আগের ভাগেই তাঁদের বিছানা বিছিয়ে রেখেছিলেন। আমি পেয়েছিলাম উপরের একখানা বাঙ্ক। চতুর্থ যাত্রী ছিল না। বুঝতে পারলাম যে আমাকে উপরে উঠতে হবে। এঁরা দুজনেই দুপুরে ঘুমোবেন বলে ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

এ মন্দ ব্যবস্থা নয়। কয়েক ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু তার পরেও যদি এঁরা নিচে বসতে না দেন তো বিপদ। আমার দিকে তাঁরা ফিরেও তাকালেন না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি উপরে একখানা চাদর বিছিয়ে উঠে পড়লাম। বালিশটাও বার করে নিলাম। আর একখানা বই হাঁতড়াতে গিয়ে টাইম টেবল বেরিয়ে পড়ল। এইটে নিয়েই এখন সময় কাটাতে হবে।

ভদ্রলোক আমার ঠিক নিচে বসেছিলেন, আর মহিলাটি তাঁর সামনে। আমি যে এই দিকের বাঙ্কে উঠব, তা বোধহয় এঁরা ভাবেন নি। এই বারে নিজেদের বিছানা বদল করে নিলেন। মানে, উপর থেকে মহিলাকে আমি দেখতে পাব না। মনে মনে আমি হাসলাম। মহিলা বোধহয় তাঁর বয়সের হিসাব ভুলে গেছেন, কিংবা আয়নায় আর নিজের দেহটা দেখেন না।

শোবার আগে ভদ্রলোক দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। আর আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বিকেলের চা বোধহয় আমার মারা গেল। তাড়াতাড়ি টাইম টেবল খুলে দেখলাম যে বিকেল সোয়া

চারটের এই ট্রেন জলারপেট্টাই জংসনে দাঁড়াবে পাঁচ মিনিটের জন্যে। তারপরে সেলম পৌছবে ছটার পরে।

এখন আমার কোন কাজ নেই। অথচ ঘুমোতেও ইচ্ছা করছে না। খানিকক্ষণ ধরে টাইম টেবলটাই দেখতে লাগলাম। বৃন্দাবন এক্সপ্রেসের মতো এ গাড়িও আর্কোনাম জংশনে দাঁড়ায় না। আর্কোনাম থেকে বড় লাইনের গাড়ি রেনিগুণ্টা হয়ে বম্বে যায়। তিরুপতি যেতে হয় রেনিগুণ্টা থেকে। আবার আর্কোনাম থেকেই ছোট লাইনের গাড়িতে কাঞ্চিপুরম যেতে হয়। আর্কোনামের পরের স্টেশন কাটপাডি থেকেও ছোট লাইনের গাড়িতে রেনিগুণ্টা যাওয়া যায়। তার পরের স্টেশন তিরুপতি ঈস্ট্।

হিসাব করে দেখলাম যে সন্ধ্যে সাতটায় ইরোডে না খেলে কোইম্বাতুরে খেতে হবে রাত নটার পরে। সন্ধ্যা বেলায় খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই, অথচ আমার সহযাত্রীরা আমাকে রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দেবেন কিনা জানি না। জানি না, কপালে আজ কী লেখা আছে ?

টাইম টেবলটা বন্ধ করে আমি যখন পাশ ফিরলাম, দেখলাম যে ভদ্রলোক শুয়ে পড়েছেন। ওধার থেকে তাঁর স্ত্রী কী বললেন বুঝতে পারলাম না, তিনি লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তারপরে তৎপর ভাবে জানালা ধরে টানাটানি শুরু করে গলদঘর্ম হয়ে গেলেন।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে জানালার কাচ দিয়ে রোদ আসছে বলেই বোধহয় ভদ্রমহিলা জানালার জাল বন্ধ করে দেবার হুকুম করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক সে কাজটি না পেরে নিজের বার্থে এসে ঝুপ করে বসে পড়লেন। আর আমার দিকে তাকালেন করুণ ভাবে।

কেন জানি না, আমি চোখ বুঁজে ঘুমের ভান করলাম। নিচে বসতে না দেওয়ায় মনে বোধ হয় ক্ষোভ হয়েছিল। নিঃশব্দে আমি তাই প্রতিশোধ নিলাম।

কিন্তু ভদ্রমহিলার কণ্ঠ এবারে কঠিন হল এবং ভদ্রলোকও বেজায় অসহায় বোধ করলেন। প্রথমে নিজের দিকের জানালাটা ধরে টানাটানি করলেন খানিকক্ষণ, তারপরে ক্লান্ত হয়ে আবার বসে পড়লেন।

ওধার থেকে মহিলা তখন অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। কথা নয়, ওজস্বিনী বক্তৃতা। উত্তরে অক্ষম ভদ্রলোক আর একবার উপরে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

এর পরে মহিলা কী বললেন জানি নে, দম দেওয়া পুতুলের মতো ভদ্রলোক ছিটকে উঠে দরজার ছিটকিনিতে হাত দিলেন। আমার মনে হল যে তিনি বোধ হয় এই কোচের অ্যাটেণ্ডাণ্ট্‌কে ডাকতে যাচ্ছেন। আর এ কথা মনে হতেই আমি উপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম।

বাইরে থেকে কেউ এসে জানালা বন্ধ করে দিলে অবস্থা আমার আয়ত্বের বাহিরে চলে যেত। আমার উপরে আক্রোশ আরও বেড়ে যেত এবং সারা দিন রাত উপরেই আমাকে শুয়ে ও বসে থাকতে হত। তার চেয়ে একটুখানি উপকার করে যদি এঁদের প্রসন্ন করা যায় তো মন্দ নয়। কোন কথা না বলে আমি একটু কৌশল প্রয়োগ করে কাচের বদলে জালের জানালাটা বন্ধ করে দিলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দেবার অবকাশ পেলেন না। তাঁর সহধর্মিনী তখন এমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে এমন কিছু বলছেন যে তিনি নিতান্ত ভাল মানুষের মতো নিঃশব্দে সব বরদাস্ত করে যাচ্ছেন। মনে হল, তাঁর অক্ষমতারই খোঁটা দিচ্ছেন। জানালা দুটো আমি বন্ধ করতে না পারলে বোধ হয় ভদ্রলোক অব্যাহতি পেতেন। আমি তাই কোন কথা না বলে আবার উপরে উঠে পড়লাম।

ভদ্রলোক মুখ নিচু করে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। তারপরে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লেন।

আমি খানিকক্ষণ এই ভদ্রলোকের নাম মনে করবার চেষ্টা করলাম। রিজার্ভেসন চার্টে তাঁর নাম দেখেছি, কিন্তু নামটা এমন যে মনে রাখা সম্ভব হয় নি। আরও কয়েকটি নাম মনে করবার চেষ্টা

করলাম। না, বাঙালী বা উত্তর ভারতীয় নাম একটিও দেখি নি। দক্ষিণ ভারতীয় নামগুলিও যেন একটু অন্য ধরনের। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর নামের সঙ্গে আমাদের বেশ পরিচয় আছে। সে ধরনের নাম একটিও মনে পড়ল না। এ গাড়ির যাত্রীরা বোধ হয় কেরালা বা কানাড়া অঞ্চলের লোক।

তারপরেই মনে হল যে না, তা ঠিক নয়। স্টেশনের বাহিরের হোটেলে খেতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। এক রকম ছুটতে ছুটতেই এসেছিলাম ক্লোক রূমের মাল খালাস করতে। বেশ ভিড় ছিল, তাই সময় লেগেছিল অনেকটা। গাড়ি ছাড়বার আগে এসে নিজের জায়গা খুঁজে বার করতেই বেশি ব্যস্ত ছিলাম। ভাল করে সহযাত্রীদের নাম দেখবার সুযোগ পাই নি। থাক সে চিন্তা, এখন একটু ঘুমিয়ে নিই। পরে ঘুরে ফিরে সব দেখা যাবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি নে। নিচের মহিলার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। হ্যাঁ, তাঁর কথাবার্তা চিৎকারেরই মতোই। কিন্তু ভদ্রলোককে তাঁর বার্থে দেখলাম না। গাড়ির দরজাও বন্ধ। অন্ধকারে কিছু ঠাহর করতে না পেরে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে ভদ্রলোক আমার বাঙ্কের নিচেই। সেই জানালা ধরেই আবার টানাটানি করছেন আর হাঁসফাঁস করছেন হাপরের মতো। বুঝতে পারলাম যে জানালার জাল তুলে দেবার হুকুম হয়েছে, আর ভদ্রলোক সে কাজ পারছেন না বলেই এই চেঁচামেচি। মানে, তাঁর অক্ষমতার জন্য অভিযোগ। কিন্তু মহিলা নিজে কিছুই করছেন না। আগের বারেও কোন চেষ্টা করেন নি।

আমার পুরনো ক্ষোভের কথা আমি ভুলে গেলাম। মায়া হল ভদ্রলোকের দুর্দশায়। তড়াক করে উপর থেকে নেমে এসে ইংরেজীতে বললাম: আপনি সরে আসুন, আমি খুলে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক পরম কৃতজ্ঞতায় ভরা করুণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর পিছিয়ে এসে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন।

শক্তির নয়, একটু কৌশলের দরকার। অনায়াসেই জানালা খুলে গেল। আগের মতো কাচও আমি লাগিয়ে দিলাম। এবং পরক্ষনেই মহিলার কণ্ঠ আবার সোচ্চার হয়ে উঠল।

আমি কী করব ভেবে পেলাম না। নিচে আমাকে কেউই বসতে বললেন না। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে আমি দরজার ছিটকিনি খুলে ফেললাম। যেন আমার বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হয়েছে এমনি ভাব। ভদ্রলোক কিছু বললেন না। মহিলা আগের মতোই চেঁচাতে লাগলেন।

বাহিরে এসে প্রথমে আমি ঘড়ি দেখলাম। না, চারটে বেশিক্ষণ আগে বাজে নি। চায়ের সময় এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি। কিন্তু চা খাব কোথায়? ভাঁড়ের চা নিয়ে কি বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে খাব? না—নিজেদের কম্পার্টমেণ্টে বসে চা খাবার দুঃসাহস আমার নেই। এই অল্প সময়েই হারিয়ে ফেলেছি সব সাহস।

করিডর ধরে আমি এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ একখানা খালি কামরার দিকে নজর পড়তেই আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এই কামরায় সরে আসতে পারলে প্রাণে যে বেঁচে যাব, তাতে সন্দেহ নেই। আমি কোন দ্বিধা না করে ঝুপ করে একটা বার্থের উপরে বসে পড়লাম।

গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম যে কোন স্টেশনে এসে পৌঁছচ্ছি। জলারপেট্টাই জংসনের নাম মনে পড়ে গেল। এইখান থেকে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন উত্তরে যায়। আর ম্যাঙ্গালোরের ট্রেন দক্ষিণে। নীলগিরি পাহাড়ে যেতে হয় কোইম্বাতুর জংশন থেকে। আর শোরানুর জংশন থেকে উত্তরে ম্যাঙ্গালোর। কোচিনের ট্রেন শোরানুর থেকে সোজা পশ্চিমে যায়।

এই কামরার জানালা খোলাই ছিল। আমি তৎপর হয়ে রইলাম চা সংগ্রহের জন্যে। এ এমন একটা অভ্যাস যে সময় মতো না পেলে মন বিষন্ন হয়, উৎসাহ হারাই কাজে।

ট্রেন থামবার পরে এক ট্রে চা সংগ্রহ করতে আমাকে বেগ পেতে হল না। কিন্তু যুৎ করে বসে সেই চায়ে চুমুক দিয়েই আমার সহযাত্রী ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম। খুশি মুখে ভদ্রলোক বললেন: এই কম্পার্টমেণ্টে জায়গা পেলেন বুঝি?

বললাম: না।

—তবে?

—খালি কামরা দেখে বসেছি।

বলতে না বলতেই দু তিন জন যাত্রী এসে কামরাটি দখল করলেন আর আমার সহযাত্রী বিরস মুখে ফিরে গেলেন নিজের কামরায়।

কিন্তু এঁরা আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে বললেন না। নিজেদের জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখে নিজেরাও বসলেন।

আমার মনে হল যে রাতের আহার পর্যন্ত আমার এইখানে বসাই নিরাপদ। তারপরে শোবার জায়গা না পেলে নিজের কামরাতেই ফিরে যাব। কিন্তু—হ্যাঁ, একটা কিন্তু আছে এই ব্যাপারে। নিঃসন্দেহে আমার সহযাত্রীরা লক্ষ্য করবার মতো চরিত্র ফিরে গিয়ে দেখাই যাক না কী হয়!

যাঁরা উঠেছিলেন তাঁরা বলছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা নিজেদের ভাষার মধ্যে দু চারটে ইংরেজী শব্দ শুনেই আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। কাজেই এখানেও আমি কোন সঙ্গী পেলাম না।

চা শেষ করে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমি নিজের কামরায় ফিরে এলাম। ভদ্রলোক আমাকে দেখেও দেখলেন না, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। আর একটা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মহিলা তাকালেন আমার দিকে।

আমি আশা করেছিলাম যে এবারে হয়তো ভদ্রলোক আমাকে নিচে বসবার অধিকার দেবেন। না দিলেও আমার নিজের অধিকার ছিল নিচে বসবার। কিন্তু আমি সেই অধিকার প্রয়োগ করলাম না। সৌজন্য প্রকাশের জন্যে দুজনকেই খানিকটা সুযোগ দিয়ে নিঃশব্দে উপরে উঠে গেলাম।

ইরোড পৌঁছবার আগেই অন্ধকার গভীর হল। ভদ্রলোক তার আগেই গাড়ির বাতি জ্বেলেছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে মহিলার কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলাম। আমিও প্রস্তুত হলাম ব্যাপারটা জানবার জন্যে।

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠেছিলেন এবং এক মুহূর্তের মধ্যে নানা রকম জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেখতে পেলাম কামরার একটা কোণা থেকে মস্ত একটা ঝকঝকে টিফিন কেরিয়ার বার করেছেন আর একটা জলের জায়গা—দুটোই স্টেইনলেস ষ্টীলের। কিন্তু মহিলার চীৎকারে বেশ থতমত খেয়ে গেলেন।

প্রথমটায় এই রাগের কারণটা আমি বুঝতে পারি নি। কী বললেন তাও বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ভদ্রলোক তখনই একটা বাস্কেটের ভিতর থেকে তোয়ালেয় জড়ানো একজোড়া কলাপাতা বার করলেন, জল দিয়ে ধুলেন সেই পাতা; আর তারপর তা হাতে ঝুলিয়ে পরবর্তী হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মহিলা নিজে কী করছেন, মাথা বার করে আমার দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে না পেরে চকিতে এক নজরে ব্যাপারটা দেখে নিলাম। তিনি তাঁর নিজের চাদর খানিকটা গুটিয়ে পাতা রাখবার জায়গা করে দিয়েছিলেন।

সৌজন্য বাঁচিয়ে যতটা দেখা যায়, ততটাই আমি দেখতে পেলাম। দুজনে বোধহয় মুখোমুখি হয়ে খেতে বসলেন। টিফিন কেরিয়ার থেকে প্রচুর আহার্য বেরোল। নানা রকমের খাদ্য। এবং মহিলাই যে বেশি খাচ্ছিলেন তা অনুমান করতে পারছিলাম। তাঁদের আহার শেষ হবার আগেই ট্রেন ইরোড পৌঁছে গেল।

বেয়ারা আমার খাবার অর্ডার নিতে দরজায় এসেছিল। জানাল যে কোইম্বাতুরে দু রকম খাবারই পাওয়া যাবে—আমিষ বা নিরামিষ। নিচের মহিলা কী বললেন জানি নে, ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন: ও গাড়িতে জায়গা পেলেন না?

বললাম: এ গাড়িতে তো জায়গা আছেই।

ভদ্রলোক আমার উত্তর শুনে যেন চুপসে গেলেন। আর তার স্ত্রীকে এই কথা বলতেই যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি নি, কিন্তু বেয়ারা পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও আমি আর তার দেখা পেলাম না।

ধীরে সুস্থে আহার শেষ করে এঁরা মুখ হাত ধুয়ে এলেন। তারপরে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন দরজায় ছিটকিনি দিয়ে।

কামরার বাহিরে যেতে আমি সাহস পেলাম না। সেই সুযোগে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব মনে হচ্ছে না। আমি তাই কোইম্বাতুরে ট্রেন পৌঁছবারই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এক সময়ে বুঝতে পারলাম যে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে। কিন্তু হাতের ঘড়িতে সময় দেখার উপায় নেই। অন্ধকার ঘর। অনুমানেই মনে হল যে রাত নটা হয়েছে। একটা বড় স্টেশনে এসে ট্রেন দাঁড়াল বলে অনুমান করতে পারলাম। লোকজন আর কোলাহলে গমগম করছিল স্টেশন। আমি সাবধানে উপর থেকে নামলাম। ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। হাঁ, কোইম্বাতুরেই পৌঁছে গেছি। বেয়ারারা খাবার নিয়ে আসছে। অর্ডার না দিয়েও খাবার পেলাম। আর সেই পরিচিত কামরাটায় গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। ভয় হচ্ছিল নিজের কামরার দরজা বন্ধ হয়ে যাবার। কিছু বিচিত্র নয়। তাতে অন্য ক্ষতি না হোক, রাতের ঘুম হয়তো নষ্ট হবে।

না, ভয় আমার অমূলক হয়েছিল। দরজা খোলাই ছিল। বাথরূম থেকে ফিরে কামরার ভিতরে আমি কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই। দুজনেই বোধহয় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মহিলার নাক ডাকছে, আর ভদ্রলোকের দিকে আর একবার তাকাতে দেখলাম যে তিনি আমার দিকেই চেয়েছিলেন, তাকাতেই চোখ বুঁজে ঘুমের ভাণ করলেন।

জানালার কাচ দিয়ে প্ল্যাটফর্মের আলো আসছে। সেই আলোতে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে আমি উপরে উঠে পড়লাম।

উপর থেকে নিচের ভদ্রলোককে আমি দেখতে পাচ্ছি। ইনি কি আর এক রঙ্গরাজন!

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। ট্রেন তখনও চলছিল। কিন্তু ভ্রমণের একটা বাসনা তখন মনের মধ্যে সবল হয়ে উঠেছে। একটা গোটা দিন আমার বেঁচে যাচ্ছে। দু দিনের কাজ এক দিনে যদি সারতে পারি তো এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখে যাওয়া সম্ভব হবে।

দেশ দেখার সুযোগ জীবনে সহজে আসে না। তাই সুযোগ এলে তাকে হেলায় হারাতে নেই। আমি উপর থেকে নেমে পড়লাম এবং সময় নষ্ট না করে বাথরূম থেকে মুখ হাত ধুয়ে এলাম।

ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস সকাল সাড়ে ছটায় ম্যাঙ্গালোরে পৌঁছয়। প্রায় সময় মতোই ট্রেন স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

দক্ষিণ রেলের শেষ স্টেশন এটি। বেশ পুরনো স্টেশন, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও মনে হল না। ওয়েটিংরূম আছে, রিটায়ারিং রূমও থাকতে পারে; কিন্তু রিফ্রেশমেণ্ট রূম নেই, ব্যবস্থা আছে লাইট রিফ্রেশ-মেণ্টের। ভাবলাম, দরকার নেই স্টেশনে থেকে, বাইরের হোটেলই ভাল। একটা অটোরিক্সা ধরে আমি হোটেলেই চলে এলাম।

পথ খোলামেলা। রাস্তায় এখন ভিড় নেই। কিন্তু বেশ বড় শহর বলে বুঝতে পারলাম। স্টেশন এলাকা ছেড়ে আসতেই দোকানপাট বাজারে জমজমাট এলাকা দেখতে পেলাম। সব বন্ধ হলেও বুঝতে পারলাম যে সময় মতো সবই লোকজন ও যানবাহনে ভরে যাবে। কলকাতাকে বাদ দিলে পশ্চিম বাঙলায় বোধহয় এ রকম শহর আর একটাও নেই।

কিন্তু যে কাজের জন্যে এত দূরে এসেছি, তা শেষ হবার আগে আমি কোনখানে গেলাম না। অফিস খোলার আগেই অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। আর এক দিন আগে আসার জন্যে তাঁরাও আশ্চর্য হলেন। কিন্তু তার জন্যে ক্ষতি হল না কোন, বরং তাঁরা আমার তাড়া দেখে

তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। বিকেলের মধ্যেই কাজ চুকে গেল। এতে আমিই আশ্চর্য হলাম সব চেয়ে বেশি।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি আজই ফিরে যাবেন?

আমি বললাম : না।

—তবে কি দিন কয়েক থাকবেন এখানে?

—তাও না।

এর পরে কী জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি বোধহয় ভেবে পেলেন না।

তাই আমিই এবারে প্রশ্ন করলাম : শহরে কী দেখবার আছে?

—এই শহরে?

সেই একটা পরিচিত বিস্ময় দেখলাম ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে। আর অনেক জায়গায় যা শুনেছি, এখানেও তেমনি শুনলাম : এখানে আর দেখবার কী আছে!

—সমুদ্র?

—সমুদ্র! সমুদ্রে কী দেখবন? আর শহরে তো সমুদ্র নেই।

বললাম : তা হলে?

ভদ্রলোক একই কথা বললেন : ম্যাঙ্গালোরে দেখবার কিছু নেই।

—সেকি!

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন : কিছু দেখতে হলে আপনাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম : কত দূরে?

দু একজনকে জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক বললেন : উডিপি যেতে পারেন।

—সে এখান থেকে কত দূরে?

দূরত্ব ভদ্রলোক জানতেন না। তাই আবার জিজ্ঞাসাবাদ করে বললেন : মাইল পঞ্চাশেক দূরে। কাল সকালে গেলে পরশু বিকেলে ফিরতে পারবেন।

আজ গিয়ে কাল সকালে ফিরতে পারব কিনা, সে কথা আমি জানতে চাইলাম না। এক দিনে যাতায়াত সম্ভব কিনা, সে কথাও না। কেন জানি না আমার মনে হল যে ভদ্রলোক এই বেড়ানোর প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইছেন। ইচ্ছে করলেই হয়তো বলতে পারতেন, চলুন, যা দেখবার আছে আপনাকে দেখিয়ে দিই। কিংবা সব জানে শোনে এমন একজনকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি। এ কথা মনে হতেই আমি তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা ছেড়ে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম।

ভদ্রলোক নিজেও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: কোথায় উঠেছেন?

বললাম: হোটেলে।

তাই শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: বাড়িতে আমার গৃহিনী নেই। তিনি থাকলে আজ রাতে আপনাকে ডিনারে ডাকতে পারতাম।

আমি অত্যন্ত বিগলিত হবার ভাণ করে বললাম: অনেক ধন্যবাদ।

বলে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

এই এ যুগের সভ্যতা। দিনে দিনে আমরা এই সভ্যতার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। শুধু পুরনো দিনের কথা মনে করে কিছু বেদনা বোধ করি। এখনও যাঁরা সেই ধারা রক্ষা করে অতিথিকে সর্ব রকমে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাদের আমরা বোকা বলি। এ যুগ মৌখিক ভদ্রতার যুগ, আন্তরিকতার যুগ অনেক কাল গত হয়েছে। তার জন্যে আক্ষেপ করাও এখন বৃথা।

পথে নেমে আবার আমার রঙ্গরাজনের কথা মনে পড়ল। রঙ্গরাজনের মতো একজন সঙ্গী থাকলে আমার কোন ভাবনা ছিল না। সাগ্রহে তিনি যে আমাকে সব কিছু দেখিয়ে আনতেন, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। নিজের কাজের ক্ষতি স্বীকার করেও হয়তো এ কাজ করতেন।

এই শহরে অটোরিক্সা খুব ছুটোছুটি করছে। একটা রিক্সা ধরে তারই উপরে উঠে বসলাম।

—কোথায় যেতে হবে ?

বললাম : নদীর ধারে।

রঙ্গরাজন আমাকে নেত্রবতী নদীর নাম বলেছিলেন, আর বলেছিলেন গুরপুর নদী। কোন্‌টা কাছে আর দূরে কোন্‌টা, তা জানি নে। নদীর ধারে শহর, এ কথাটা মনে ছিল বলেই আমি নদীর কথা বললাম।

অনেকটা পথ ঘুরে ফিরে আমি নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। খেয়া ঘাট এটি। মোটর লঞ্চ পারাপার করছে, দেশী নৌকোও আছে। কিন্তু সে সব ঠিক ওপারে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অনেকটা দূরে। সেখানে বোধ হয় কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম আছে।

সমুদ্রের কথা আমি জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম যে এই সব নৌকোয় চেপে সমুদ্র দেখে আসা যায়। মোটর লঞ্চ তখন ছেড়ে গেছে। দেশী পালতোলা নৌকো ছাড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু কেন জানি না, আমি নৌকোয় চেপে সমুদ্র দেখতে যাবার কথায় উৎসাহ পেলাম না। বোধ হয় বেলার দিকে তাকিয়ে। দিনের আলো তখন অনেক নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম : বন্দর কত দূরে ?

উত্তরে জানলাম যে বন্দরে যেতে হলে আমাকে শহরের বাস ষ্ট্যাণ্ডে যেতে হবে। সেখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে বন্দর।

রঙ্গরাজন আমাকে এই কথাই বলেছিলেন। সমুদ্রের চেয়ে নাকি পাহাড় নিকটে। কিন্তু কোন পাহাড় দেখতে পাই নি বলে সে কথাও জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তর তখনি পেয়ে গেলাম : কাদ্রি পাহাড়। সে বেশি দূরে নয়। ঐ রিক্সয় চেপে চলে যান, মঞ্জুনাথ শিবের মন্দিরও দেখতে পাবেন।

—তাহলে শিবের মন্দিরই দেখা যাক।

বলে আমি সমুদ্রের দিকে না গিয়ে একখানা অটো রিক্সায় চেপে পাহাড়ের দিকেই চলে গেলাম।

শহরের উপকণ্ঠে এই কাদ্রি পাহাড়, মাথা নিচু করে একটি মন্দিরকে যেন ঘিরে রেখেছে। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ঘর বাড়ি, নারকেলের বন। আর নিচে প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মাঝে মন্দির। তার সাদা চূড়া দিনান্তের রঙীন আলোয় ঝলমল করছে। ব্যারাকের মতো যে গৃহ মন্দিরের চারি দিক ঘিরে আছে, কেরালায় তাকে বলে নালম্বলম। কিন্তু ম্যাঙ্গালোর হল দক্ষিণ কানাড়ার শহর। এখানে তার কী নাম তা জানি না। কানাড়াভাষী এই অঞ্চল পড়েছে কেরালার ভাগে। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের সময় এই সব অঞ্চল ভাগাভাগি হয়েছে নূতন মানচিত্রে। সব সময় আমরা সব কথা মনে রাখতে পারি নে।

মন্দির দেখে যখন বাইরে এলাম, তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। অটোরিক্সাটা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে যে রিক্সা পাওয়া যাবে না, সে কথা একবারও মনে হয় নি। তাই আমাকে নির্জন পথ ধরে অনেকটা হাঁটতে হল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। নির্জন পথ হল নিস্তব্ধ। পথের দুধারে ঘর বাড়িতে একটা দুটো করে আলো জ্বলে উঠল, কিন্তু রিক্সা মিলল না একটাও। পথের দূরত্বের একটা অনুমান ছিল আমার, তাই বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতেই আমি শহরের পথে পৌঁছে গেলাম। তারপরে একটা রিক্সা পেয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

পথে বাস ষ্ট্যাণ্ডে একবার থেমেছিলাম। খবর নিয়েছিলাম মার্কারার বাসের। ভোর ছটা থেকে বাস ছাড়ে। মার্কারা পৌঁছতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম যে প্রথম বাস ধরেই ফিরব।

তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ব বলে খাবার টেবিলে এসে বসলাম কিন্তু খাবার আসবার আগেই আর এক ভদ্রলোক এসে টেবিলে বসলেন। অনেকক্ষণ একা থেকে গল্প করার বাসনা আমার জেগেছিল। আমি একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক নিজেই প্রথমে মুখ খুললেন, বললেন : অনেক দূর থেকে এসেছেন বুঝি!

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম : কেন বলুন তো?

—আপনাকে এ অঞ্চলের লোক বলে মনে হচ্ছে না।

—সত্যিই তাই। আমি পাটনা থেকে আসছি।

—পাটনা!

—হ্যাঁ, বিহারের রাজধানী। আপনি?

ভদ্রলোক বললেন : আমি এ অঞ্চলেরই লোক, বম্বে শহরে আমার ব্যবসা।

—বম্বে!

—ভাবছেন অনেক দূর! মোটেই নয়। এখান থেকে বম্বে মাত্র চারশো বারো মাইল।

বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না। বললাম : বলেন কি!

ভদ্রলোক হেসে বললেন : ট্রেনে নয়, জাহাজে।

—আপনি জাহাজে যাতায়াত করেন!

—তাতেই আমার সুবিধে। সপ্তাহে দুদিন এখান থেকে জাহাজ ছাড়ে। ভারি সুন্দর এই জাহাজের পথ। কোঙ্কন উপকূলের শোভা আর ছোট ছোট শহর দেখতে দেখতে আপনি বম্বে পৌঁছে যাবেন।

এই ভদ্রলোকের কাছেই আমি ছোট ছোট শহরের কথা শুনলাম। ম্যাঙ্গালোর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তরে মালপেতে জাহাজ প্রথমে দাঁড়ায়। দক্ষিণ কানাড়ার সব চেয়ে ভাল স্বাভাবিক বন্দর। দরিয়া বাহাদুরগড় নামে একটি দ্বীপ তাকে আড়াল করে রেখেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক জায়গাও বটে। ১৮৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামা

এসে নেমেছিলেন তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে সেণ্ট মেরিস আইল্‌স্‌-এ, একটা ক্রশ সেখানে পুঁতে দিয়েছিলেন।

এর পরে কান্দাপুর হল আরও মাইল কুড়ি উত্তরে। বেদনুর রাজাদের প্রাচীন বন্দর এটি। তিনটি নদী এসে এখানে মিলেছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: বেদনুর রাজাদের কথা বোধ হয় ইতিহাসে পড়েছেন!

বললাম: না।

—ষোড়শ শতাব্দীতে এঁরা রাজত্ব করতেন। মাইল ত্রিশেক দূরে মাইসোর রাজ্যে তাঁদের রাজধানী ছিল বেদনুর বা হায়দরনগরে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু এক মালভূমিতে। এখন আর সেখানে দেখবার কিছু নেই।

তারপরে বললেন আরও মাইল কুড়ি উত্তরে ভাটকল বন্দরের কথা। পুরাকালে এটি বিজয়নগরের বন্দর ছিল। তারপর দুটি ছোট বন্দর ছাড়িয়ে কারোয়ার হল উত্তর কানাড়ার প্রধান শহর। দূরত্ব হবে মাইল ষাটেক। কালী নদীর তীরে এও একটি ঐতিহাসিক স্থান। প্রথমে ইংরেজ এসেছিল গোলমরিচের ব্যবসা করতে, তারপরে পর্তুগীজরা দখল করেছে দুর্গ। পুরনো কারোয়ারে এখন দেখবার কিছু নেই। ওয়েস্টার রকে একটা লাইট হাউস আছে আর পর্তুগীজদের দ্বীপ আঞ্জেদিভ। নতুন কারোয়ার কর্ণাটক রাজ্যের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন শহর। বাস আসে গোয়া থেকে, হুব্‌লি ধারোয়ার ও বেলগাঁও থেকে।

গোয়া এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে। বন্দর হল মর্মাগাও, আর রাজধানী পানাজি হল মাণ্ডবী নদীর তীরে। বম্বে থেকে পানাজিতেও জাহাজ যাতায়াত করে। চৌগুলে কোম্পানীর জাহাজ।

ভদ্রলোক আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন: পানাজি দেখেছেন?

বললাম: না।

ভদ্রলোক বললেন : সুবিধে পেলে দেখে যাবেন। সমুদ্রের ধারে এমন সুন্দর শহর এ দেশে বোধহয় আর নেই। সত্যি বলতে কি, এখনও একে ভারতীয় শহর বলে মনে হবে না।

—তবে ?

—পর্তুগীজরা তো প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেছে। এখনও মনে হবে যে এ তাদেরই শহর। সেখানে গেলেই তফাৎটা আপনার নজরে পড়বে।

তারপরে ভদ্রলোক আবার পুরনো কথায় ফিরে এলেন। বললেন : বম্বের পথে আর দুটি সুন্দর শহর আছে—ভেনগুরলা মাইল ত্রিশেক দূরে। আর সেখান থেকে মাইল চুরাশি দূরে রত্নগিরি মহারাষ্ট্রের শহর। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা ভেনগুরলায় ফ্যাক্টরি তৈরি করেছিল, আর জলদস্যুর জন্যে বিখ্যাত ছিল এই জায়গা। ম্যাঙ্গালোরের জাহাজ ভেনগুরলার পরে আর দাঁড়ায় না। সোজা চলে যায় বম্বে।

বললাম : রত্নগিরি !

ভদ্রলোক বললেন : চমৎকার জায়গা। বর্মা জয়ের পরে ইংরেজ বর্মার রাজা থিবোকে এই রত্নগিরিতে এনে বন্দী করে রেখেছিল একটা সুন্দর বাড়িতে। সেই বাড়িটি আজও আছে।

আমি বললাম : রত্নগিরির লোক তাহলে কী করে ?

—রত্নগিরিতে দাঁড়ায় গোয়ার জাহাজ। শুধু রত্নগিরিতে নয়, আরও অনেক ছোট ছোট জায়গায় দাঁড়ায়। যাত্রীরা ওঠা-নামা করে, আবার জাহাজ চলে। সে সব জায়গার নাম আমি জানি নে। তবে শুনেছি যে গোয়ার জাহাজ বম্বে থেকে রোজ ছাড়ে, বহু যাত্রী এই পথে যাতায়াত করে।

তারপরে ভদ্রলোক বললেন : কিছু ভাববেন না, কিছু দিন পরে বম্বে এসে শুনবেন যে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে তৈরি হয়ে গেছে। এখনও যে পথ নেই, তা নয়। তবে কোথাও

ভাল, কোথাও ভাল নয়। দেখতে দেখতেই ভাল রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে।

তারপরে বুঝিয়ে বললেন : বম্বে থেকে গোয়া পর্যন্ত সুন্দর রাস্তা পুনা কোল্হাপুর ও রত্নগিরি হয়ে পানাজি এসেছে, নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। পানাজি থেকে দক্ষিণে কারোয়ার পর্যন্ত রাস্তা সুন্দর। এর পরেও আরও পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত রাস্তা ভাল। গোকর্ণয় মহাবলেশ্বর শিবের মন্দির—বড় তীর্থস্থান এটি। তারপরে বাস বদল করে কিংবা ট্যাক্সিতে ম্যাঙ্গালোর আসা যায়। এই রাস্তা ভাল হয়ে গেলে ট্রেনে হুব্লি ব্যাঙ্গালোর ঘুরে কেউ আর ম্যাঙ্গালোরে আসবে না।

বেয়ারা আমার খাবার অনেকক্ষণ আগেই দিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোকের অর্ডারও নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ সে কথা বুঝতে পেরে বললেন : একি, আপনি হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন ?

বললাম : আপনার খাবার আসুক।

—না না, খাবার ঠাণ্ডা করবেন না। গল্পতো আমি শোনাচ্ছি, আপনি খেতে খেতেই শুনুন।

বেয়ারাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর খাবারও আসছে। তাই বললাম : আপনার খাবারও এসে গেছে। এক সঙ্গেই খাওয়া যাবে।

বেয়ারা যখন তাঁর খাবার টেবিলে সাজিয়ে দিচ্ছিল, আমি তখন পথের কথাই ভাবছিলাম। বম্বে থেকে গোয়া পর্যন্ত ট্রেন আছে বলে আমি জানি। বম্বে থেকে মিরাজ পর্য্যন্ত বড় লাইন, তারপরে ছোট লাইনের গাড়ি লোন্ডা জংসন হয়ে গোয়ায় প্রবেশ করে। মারগাও নামে একটা স্টেশনে নামলে পানাজি আসা যায় মোটরে। এ লাইনের শেষ স্টেশন ভাস্কো-ডা-গামা থেকেও পানাজির পথ আছে। তাই বললাম : বম্বে থেকে গোয়ায় তো ট্রেনেও আসা যায়!

ভদ্রলোক থেমে গিয়ে বললেন: সে পশ্চিম ঘাট পাহাড়ের পূর্ব দিক দিয়ে। বাসও এই পথে আসছে। কিন্তু কোঙ্কণ উপকূল হল পাহাড়ের পশ্চিমে। এ দিকেও যে ভাল পথ-ঘাটের দরকার, সে বিষয়ে সবাই এক মত হয়েছেন।

খেতে খেতেও ভদ্রলোক গল্প বলতে লাগলেন, বললেন: ম্যাঙ্গালোরের কাছেও কয়েকটি সুন্দর দর্শনীয় স্থান আছে।

তারপর রঙ্গরাজনের মতো জিজ্ঞাসা করলেন: মুদ্‌বিদ্‌রির নাম শুনেছেন? কর্কল আর ভেন্নুরের নাম?

সত্যি কথাই বললাম: মনে পড়ছে না।

ভদ্রলোক বললেন: এ দিকের পথ-ঘাট ভাল হলে সমস্ত ভারতের লোক এ সব জায়গার নাম জানত।

—কেন?

ভদ্রলোক বললেন: শ্রবণবেলগোলার নাম শুনেছেন?

বললাম: শুনেছি।

—তবেই দেখুন। ব্যাঙ্গালোর মাইসোর থেকে ভাল পথ আছে বলে শ্রবণবেলগোলায় গিয়ে গোমতেশ্বরের মূর্তি দেখে আসছে, আর বলছে, সে এক অদ্ভুত কীর্তি, পৃথিবীর আর কোথাও অমন বিরাট মূর্তি নেই। অথচ এ দিকেও যে অমন আরও দুটো মূর্তি আছে, সে কথা কেউ জানে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: সত্যি নাকি!

—সত্যি বৈকি।

বলে ভদ্রলোক বললেন: কর্কল আর ভেন্নুর—দু জায়গাতেই একটা করে জৈন মূর্তি আছে শ্রবণবেলগোলার মতো। একটু সময় করে গিয়ে দেখে আসুন না! কানাড়ায় আসা আপনার সার্থক হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম: কত দূর এখান থেকে?

ভদ্রলোক বললেন: মুদ্‌বিদ্‌রি থেকে বারো মাইল উত্তরে কর্কল, আর মুদ্‌বিদ্‌রি এখান থেকে বাইশ মাইল উত্তর পূর্বে।

ভাল রাস্তা, বাস সার্ভিস আছে মুদ্‌বিদ্‌রি পর্যন্ত। সেখান থেকে চলে যাবেন। রাস্তা খারাপ নয়, বাসও চলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

—তারপর?

—ফিরে এসে ভেন্নুরে যাবার চেষ্টা করবেন। রাস্তা ভাল নয়, যানবাহনের অভাবে একটু কষ্ট করেই যেতে হয়।

—দূর কত?

—কর্কল থেকে ষোল মাইল পূর্বে। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে একবার দেখে এলে বলতেন যে পৃথিবীতে বিরাট মূর্তি একটা নয়, আছে তিনটে। শ্রবণবেলগোলা, কর্কল আর ভেন্নুরে। ওই সঙ্গে লোকের ভুল ভেঙ্গে দিতে পারতেন।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললাম: মুদ্‌বিদ্‌রিতেও কিছু দেখবার আছে নাকি?

—আছে বৈকি।

বলে তিনি মুদ্‌বিদ্‌রির গল্প সবিস্তারে বললেন। মনে হল, ও জায়গাটা তিনি নিজে দেখে এসেছেন, আর কর্কল ও ভেন্নুরের কথা শুনেছেন অন্য লোকের মুখে। মুদ্‌বিদ্‌রির দর্শনীয় বস্তু হল একটি মন্দির। অপরূপ সুন্দর তার স্থাপত্য কর্ম। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ অনেক চিত্রের কথা তিনি ফলাও করে বললেন। তারপরে অনুরোধ করলেন: একবার গিয়ে দেখে আসুন এই মন্দির।

আমি বললাম: সময় থাকলে নিশ্চয়ই দেখে আসতাম।

ভদ্রলোক বললেন: বেশি সময় লাগবে না, এক বেলাতেই ফিরে আসতে পারবেন।

খেতে খেতেই আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক মিথ্যা বলেন নি। ম্যাঙ্গালোর থেকে বাইশ মাইল এমন কিছু দূর নয়, আর মুদ্‌বিদ্‌রি থেকে বারো মাইল গেলে পৃথিবীর বৃহত্তম একটা মূর্তি দেখা যাবে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে এই দুটো জায়গা

দেখে এলে সত্যিই যে নতুন অভিজ্ঞতা হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল সময়ের। এ দিকে একটা দিন কাটালে পাহাড়ী রাজ্য কুর্গ দেখা হবে না।

আমাকে অন্য মনস্ক দেখে ভদ্রলোক বললেন: কী ভাবছেন?

বললাম: এই ম্যাঙ্গালোর শহরটাই আমার দেখা হল না।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নীরবে রইলেন। তারপরে বললেন: লোকে ভাবে নতুন শহর, কিন্তু তা নয়। খুব পুরনো বন্দর এই ম্যাঙ্গালোর। পুরাকালে এখানে জমজমাট বাণিজ্য ছিল। শুনেছি, ছশো বছর আগে ইবন বতুতা লিখেছিলেন যে সে সময়ে চার হাজার মুসলমান বনিক এই বন্দরে বাস করত। দুশো বছর আগের কথা লিখেছেন ফর্বেস। তখন এটি প্রধান বন্দর ছিল হায়দার আলির। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের বন থেকে সেগুন কাঠ কেটে এইখানে তাঁর জাহাজ তৈরি হত। কফি আর এলাচ রপ্তানি হত বাইরে, আর এইখান থেকেই সব চেয়ে বেশি কাজু চালান যেত।

ইতিহাসের কথাও বললেন ভদ্রলোক। পুরাকালেও ম্যাঙ্গালোর ছিল মহিস্থুর রাজ্যের অধীনে। দেশের রাজা ছিলেন হায়দার আলি। হঠাৎ এক দিন জানা গেল যে ইংরেজ ম্যাঙ্গালোর অধিকার করেছে। তখন ছিল ১৭৬৮ সাল। কিন্তু হায়দর আলির যোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজকে তাড়িয়ে ম্যাঙ্গালোর অধিকারের সংকল্প করলেন। ১৭৮৩ সালের ৬ই মে আক্রমণ করলেন ম্যাঙ্গালোর। এইচ. এম. ফর্টিসেকেণ্ড ফুটের কর্ণেল জন ক্যাম্পবেল তাঁর আঠারো শো পঞ্চাশ জন সেনা নিয়ে লড়তে লাগলেন। প্রবল বাধা দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু টিপু সুলতানের দেশী জওয়ানদের সামনে বেশি দিন দাঁড়াতে পারেন নি। ১৭৮৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী কর্ণেল ক্যাম্পবেল পরাজয় স্বীকার করেন। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্বের কাহিনী ম্যাঙ্গালোরের ইতিহাসে এখনও লেখা আছে।

যেতে যেতেই ভদ্রলোক বললেন : খুব দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এই অঞ্চলের। দূর আর দূর থাকবে না। আগামী কালের মানুষ বম্বে থেকে মোটর বাসে চেপে ম্যাঙ্গালোরে আসবে আরব সাগরের ধার দিয়ে। পথ তো মোটে চার শো বারো মাইল !

বললাম : ব্যাঙ্গালোর থেকে ট্রেনও আসবে শুনেছি।

ভদ্রলোক বললেন : আসবেই তো। বাণিজ্যের প্রয়োজনেই আসবে। আর ছোট লাইন নয়, বড় লাইনের ট্রেনই চলবে অদূর ভবিষ্যতে।

দুজনেরই খাওয়া শেষ হয়েছিল। রাতও হয়েছিল। খুব অল্প কথায় আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিলাম।

রাতে আমাকে নানা রকমের ভাবনা পেয়ে বসেছিল। রঙ্গরাজনের কথা মতো উডিপি যাব, না ডিনার টেব্‌লের ব্যবসাদার ভদ্রলোকের পরামর্শ মতো মুদ্‌বিদ্‌রি আর কর্কল। এই অঞ্চলেই একটা দিন ব্যয় করা কি উচিত হবে, না কুর্গের মার্কারায় এই দিনটি কাটাব! নানা যুক্তি দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছুতে পারলাম না। তার আগেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ভোরবেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখনও পাঁচটা বাজে নি। মনে পড়ল যে ছটা থেকে মার্কারার বাস ছাড়ে। রঙ্গরাজন আমাকে ঠিকই বলেছেন—রেলগাড়িতে ম্যাঙ্গালোরে গেলে বাসে ফেরা উচিত কুর্গের প্রধান শহর মার্কারার উপর দিয়ে। মনে হল এই যে বাস ধরবার জন্তেই আজ এমন সময় আমার ঘুম ভেঙেছে।

এ কথা মনে হতেই আমি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলাম না। মুখ হাত ধুয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্তে তৈরি হয়ে নিলাম। হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম, কিন্তু চা পেলাম না। তার জন্তে দুঃখ নেই। চুরাশি মাইল পথ সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছয়। আর পথেই পাওয়া যায় ব্রেকফাস্ট। বাস স্ট্যাণ্ডে কি এক ভাঁড় চা কিংবা কফি পাওয়া যাবে না!

একখানা অটোরিক্সা ধরে আমি বাস স্ট্যাণ্ডে চলে এলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে খানিকটা দমে গেলাম। টিকিটের কাউণ্টারে লোক আছে, কিন্তু বাস না এলে টিকিট পাওয়া যাবে না। কেউ বলছে যে বাস এলে আর টিকিটের দরকার নেই, বাসে উঠে বসলেই টিকিটের ভাবনা গেল। জায়গা পাওয়া হল আসল কথা।

ইচ্ছা ছিল যে টিকিট কেটে একটু চায়ের চেষ্টা করব। কিন্তু টিকিট না পেয়ে সে বাসনা আমি সাময়িক ভাবে বিসর্জন দিলাম।

আর একটি ভাবনাও ছিল। সঙ্গে যে মালপত্র আছে, তা বাসের মাথায় তুলতে হবে। স্যুটকেশ আর হোল্ডল। ব্রীফ কেসটি আমার হাতে আছে, হাতেই থাকবে। যাত্রীর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু বড় মালপত্র নেই কারও। ছোট ছোট অ্যাটাচি কেস বা হ্যাণ্ড ব্যাগ আছে, কারও বা কাপড়ের ঝোলা। তাদের দিকে চেয়ে আমার ভাবনা আরও বাড়ল। মালপত্র বাসের উপরে তোলবার পরে ভিতরে বসবার জায়গা পাব কিনা সেই ভাবনা।

এই রকম সময়ে আমার একজন সঙ্গীর প্রয়োজনের কথা মনে হয়। দেশভ্রমণে বেরোলে একজন সঙ্গীর খুবই দরকার। কাজের কথা ছেড়ে দিলেও একা সময় কাটানোও কঠিন কাজ। বোধ হয় একজন সঙ্গীর খোঁজেই আমি নিজের চারিধারে অনুসন্ধানীর চোখ নিয়ে তাকালাম। আর দেখতে পেলাম আইয়াপ্পাকে। ভদ্রলোকের নাম ধাম তো আমি জানতাম না, আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখেই তাঁর দিকে আমার চোখ পড়েছিল।

মনে হল যে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আর আমারও প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্যে হাত তুলে নমস্কার করলাম।

ঠিকই বুঝেছিলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন: বিদেশী মনে হচ্ছে আপনাকে!

আমিও দু পা এগিয়ে গিয়ে বললাম: বিদেশী নয়, অন্য রাজ্যের লোক।

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন: আমি সেই কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

আমি তাঁকে লজ্জা দিতে চাই নি। তাই হেসে বললাম: আমি বুঝেছিলাম আপনার কথা। আপনি কি এই অঞ্চলের লোক?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরেই ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম তাঁর আইয়াপ্পা। কুর্গের অধিবাসী, বাস করেন গোয়ায়।

পারিবারিক প্রয়োজনে দিন কয়েকের জন্যে বাড়ি যাচ্ছেন। নিজের কথা শেষ করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি ?

আমিও নিজের নাম জানিয়ে বললাম ঃ বাঙলার অধিবাসী, বাস করি পাটনায়। কাজে এসেছিলাম ম্যাঙ্গালোরে, ফিরছি মার্কারার উপর দিয়ে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ ভাল করেছেন।

—তাই বলছেন !

—হ্যাঁ। এতে আপনার খরচ কম হবে, সময়ও বাঁচবে।

—কেন ?

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন ঃ রেলের ভাড়া তো জানেন, প্রতি দিন বেড়ে বেড়ে কী ভয়ঙ্কর হয়েছে ! আমিতো রেলে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম ঃ আপনি কি এতটা পথ বাসে এলেন !

সগৌরবে ভদ্রলোক বললেন ঃ একটুর জন্যে কাল রাতে শেষ বাসখানা ছেড়ে গেল, তা না হলে এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছে যেতাম।

আমি সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তিনি বললেন ঃ কাল ভোরের বাসে পানাজি থেকে কারোয়ারে এসেছিলাম। তারপর শেয়ারে একখানা ট্যাক্সিতে এসেছি ম্যাঙ্গালোরে। মারগাওএ রেলে চাপলে হুব্‌লি এসে হাসান পৌঁছতে দু দিন লাগত। হাসান থেকে আবার বাস। বাস ছাড়া আমার গতি নেই।

—সত্যি !

—সত্যি বলছেন কি ! আপনারও সেই অবস্থা। আজ সকালে ম্যাঙ্গালোর মেলে উঠলে কাল বিকেলে পৌঁছবেন ম্যাড্রাস। বাসে ব্যাঙ্গালোর আজ রাতেই পৌঁছতে পারবেন।

কিন্তু ব্যাঙ্গালোর যে আমার গন্তব্য স্থান নয়, সে কথা বলবার আগেই একটা কলরব উঠল। যাত্রীরাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত সমস্ত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: মার্কারার বাস এসেছে আপনার মালপত্র উপরে তুলে দিয়ে আসুন, আমি আপনার জায়গা দখল করছি।

বলে ভদ্রলোক বাসের দরজার দিকে ছুটে গেলেন।

কিন্তু আমি আমার মালপত্র আর খুঁজে পেলাম না। এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে যা পাহারা দিচ্ছিলাম, চক্ষের নিমেষে তা কোথায় অন্তর্হিত হল বুঝতে পারলাম না। যে ছোকরাটি অটোরিক্সা থেকে আমার মালপত্র নামিয়ে ছিল, তাকেও কোথাও দেখলাম না। আর দেখতে পেলেও চিনতে পারব না তাকে। দুশ্চিন্তায় মন আমার কণ্টকিত হয়ে উঠল। রাগ হল আইয়াপ্পার উপরই। কথা বলবার জন্যে ভদ্রলোক এগিয়ে না এলে মালের উপরে আমার নজর নিশ্চয় থাকত, বিদেশে হারাতে হত না জিনিষপত্র।

কী করব ভেবে না পেয়ে যখন বাসের দরজার দিকে এগোলাম তখন তার ছাদের উপর থেকে চিৎকার শুনলাম একটা। দেখলাম সেই ছোকরাটি আমার হোল্ডল তুলেছে উপরে, আর একটি ষ্ট্র্যাপ খুলে লোহার রেলিঙের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছে।

পরক্ষণেই সে তরতর করে নিচে নেমে এল। সুটকেসটি নিচে রেখে উপরে উঠেছিল। এবারে সেটি মাথায় নিয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করতেই একজন যাত্রী তাকে টেনে ধরলেন, নিজেদের ভাষায় কিছু বললেন। আর ছোকরাটিও জবাব দিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপরে ভদ্রলোক আমাকে বললেন: এই ছোট সুটকেস আপনি উপরে তুলতে বলেছেন কেন? ওপর থেকে পড়ে যাবার ভয় আছে। এটা নিজের কাছেই রাখুন।

বলে ছোকরাটিকে ঠেলে বাসের ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও বাসে উঠে পড়লাম।

আইয়াপ্পা যে আমাকে চোখে চোখে রেখেছিলেন, তা বুঝতে পারলাম বাসের ভিতরে পা দিয়েই। সামনের দিক থেকে তিনি বলে উঠলেন : এই দিকে চলে আসুন।

ছোকরাটি আমার সুটকেশ নিয়ে তাঁর কাছেই গিয়েছিল। তিনি বেশ কায়দা করে সেটি রাখিয়ে নিলেন। উপরে যে র‍্যাক আছে তাতে জায়গা হবে না বলে যাতায়াতের পথে এমন ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে কারও অসুবিধা হবে না। আমি কাছে এলে আমার ব্রীফ কেসটি কেড়ে নিয়ে উপরের র‍্যাকে তুলে রাখলেন।

হারানো মাল ফিরে পেয়েছি বলে মনটা আমার প্রসন্ন হয়েছিল। আমি একখানা এক টাকার নতুন নোট ছেলেটির হাতে দিলাম। তাকে ইতস্তত করতে দেখে আমি ইসারায় জানিয়ে দিলাম যে গোটা টাকাটাই তাকে দিয়েছি। এক লাফে ছেলেটি চলে যাবার উপক্রম করতেই আইয়াপ্পা তার হাত টেনে ধরে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন। সে বেচারা কাঁদ কাঁদ মুখে আমার দিকে তাকাল। ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাস করলাম : কী হয়েছে?

ভদ্রলোক বললেন : কী হতভাগা দেখেছেন! আপনার চেঞ্জ না দিয়েই পালাচ্ছিল!

আমি বললাম : গোটা টাকাটাই আমি ওকে দিয়েছি।

—অ্যাঁ!

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

অতি কষ্টে আমি তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝালাম যে সে বেচারা অটোরিক্সা থেকে আমার মাল নামিয়েছে, অপেক্ষা করেছে এতক্ষণ —তার মজুরির দাম, তার সততার দাম—

—কিন্তু এর পরে কি সে আমার কাছে পঁচিশ পয়সা নেবে!

বলে ভদ্রলোক ছেলেটির হাত ছেড়ে দিলেন। সে বেচারা পালিয়ে যেন বাঁচল। আর আমি দুঃখ প্রকাশ করে বললাম : এ কথা আমি ভাবি নি।

ব্যাপারটা মানিয়ে নিতে ভদ্রলোকের সময় লাগল না। সীটের বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন : আপনি এই জানালার ধারে বসুন।

জানালার ধারটিই যে বেশি লোভনীয় তাতে সন্দেহ নেই। তবু আমি ভদ্রতা করে বললাম : নানা, আপনি ঐ ধারে বসুন।

কিন্তু আইয়াপ্পা আমাকে ঠেলে দিয়ে বললেন : আপনি নতুন যাত্রী, আপনি বসুন এই ধারে।

বলে নিজে ভিতরের দিকে বসে পড়লেন।

আমি আর আপত্তি না করে বসে পড়তেই ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : এ পথে আমি প্রায়ই যাতায়াত করি। পথঘাট আমার সব চেনা, পথের কৌতূহল আর আমার নেই। আর আপনি আসছেন অন্য রাজ্য থেকে। এ দিকে আর আসবেন কিনা তারও ঠিক নেই। কাজেই আপনারই এ ধারটায় বসা দরকার।

আমি হেসে বললাম : এ যুগের মানুষ এ সব যুক্তি-তর্কের কথা ভাবে না। মনে হয়, আপনি এখনও সেকেলে আছেন।

ভদ্রলোকও হেসে বললেন : বোধ হয় তাই।

নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়ল।

আইয়াপ্পা একটা হাঁপ ছেড়ে বললেন : আজ আমাদের ভাগ্য ভাল।

—কেন ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন : যে বাস উডিপি থেকে আসে, তা লেট হয় মাঝে মাঝে। যে বাস এখান থেকে ছাড়ে, তাও অনেক সময় দেরি হয়। সরকারী কাজে-কর্মে গাফিলতি অনেক বেড়েছে। ডিপো থেকে বাস বেরোবার সময় গলদ ধরা পড়ে। হাতের কাছে অন্য গাড়ি না থাকলেই দেরি হয়ে যায়।

তারপরে একটু থেমে বললেন : সময় মতো বাস ছাড়লে অন্য রকমের ভয় আছে।

—ভয়!

—হ্যাঁ, ভয়ই বলতে পারেন।

কথাটা বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন: শেষ মুহূর্তে ডিউটিতে এসে চেক না করেই বাস বার করে আনে ড্রাইভার। তারপরে মাঝপথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে, কল বিগড়েছে, গাড়ি আর যাবে না।

—তাও হয় নাকি।

—অসম্ভব কিছুই নয়।

কিন্তু আমি তাঁর ভয়ের কথা শুনে হাসলাম।

আমার হাসি দেখে ভদ্রলোক বললেন: মার্কারায় না পৌঁছানো পর্যন্ত হাসবেন না।

কিছু দূর এগোবার পরেই শহর শেষ হয়ে গেল। তারপরে আরও খানিকটা এগিয়ে নতুন রেলপথ নির্মাণের দৃশ্য দেখতে পেলাম। কোথাও পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে চলেছে রেলপথ, কোথাও নদীর তীর ধরে চলেছে। ম্যাঙ্গালোরের প্রিয় নদী নেত্রবতী গুরুপুর নদীর সঙ্গে মিলে সমুদ্রে পড়েছে। ফেরিঘাটে গিয়ে তার শোভা দেখেছি। আইয়াপ্পা আমাকে নদীর তীরে নতুন স্টেশন এলাকা দেখিয়ে দিলেন।

ম্যাঙ্গালোর থেকে হাসান রেলপথে যুক্ত হচ্ছে। ছোটখাটো কালভার্ট ও পুল তৈরি হয়ে গেছে, বড় পুল তৈরির কাজ কিছু বাকি আছে। এই রেলপথ নির্মাণের কাজ যে খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তা যাত্রীদের কাছেই শুনলাম।

একজন বললেন: এত দিন পরে রেল কর্তৃপক্ষ বুঝেছে যে ম্যাঙ্গালোরকে ব্যাঙ্গালোরের সঙ্গে সোজা পথে যুক্ত করা দরকার। যাত্রীরা তো বাসেই বেশ যাতায়াত করছে, অসুবিধা হচ্ছে মাল পরিবহনের। এই লাইন তৈরি হয়ে গেলে ম্যাঙ্গালোর বন্দরেরও উন্নতি হবে।

আর একজন বললেন ঃ কিন্তু কুর্গের সুবিধা হবে না।

—কেন ?

—মার্কারার উপর দিয়ে এই রেলপথ চলবে না।

অন্যজন বললেন ঃ না চললেও ক্ষতি নেই। আমরা এমনি করেই যাতায়াত করব আর এক পুরুষ।

—তারপর ?

—তারপর এ দিকেও রেল চলবে। ম্যাঙ্গালোর থেকে মার্কারা, হাসান আর মাইসোর থেকেও মার্কারা। মার্কারা তখন উটির চেয়েও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

আর একজন বাধা দিয়ে বললেন ঃ এ আপনার দুরাশা।

—কেন ?

—তিন দিক থেকে পাহাড়ের উপরে রেল লাইন উঠবে ভেবেছেন !

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলে অনেকেরই মনে হল। আলোচনা থমকে গেল খানিকক্ষণের জন্য। ইংরেজীতে সবাই কথা বলছিলেন না। যে ভাষায় কথা হচ্ছিল, তার নাম কানাড়া। ম্যাঙ্গালোর কানাড়া জেলায় বলেই কর্ণাটক রাজ্যে যুক্ত হয়েছে। আমাকে এই সব আলোচনার কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আইয়াপ্পা। বললেন ঃ মার্কারা এ দিক থেকে চুরাশি মাইল, পঁচাত্তর মাইল মাইসোর থেকে, আর হাসান থেকে মাইল ষাটেক। মোট কত হল বলুন তো !

কতকটা আন্দাজে বললাম ঃ দুশো মাইলের কিছু বেশি।

ভদ্রলোক বললেন ঃ বুঝুন তাহলে। এক মাইল রেলপথ পাততে কত কোটি টাকা যেন লাগে।

বললাম ঃ জানি না।

দৃঢ় স্বরে আইয়াপ্পা বললেন ঃ অসম্ভব। পাহাড়ের উপর দুশো মাইল পথ কোন দিন তৈরি হবে না। উটির মতো না হলেও মার্কারা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

আমি বললাম : ব্যয়সাধ্য বলে তো কিছু ঠেকে থাকছে না! তিন দিকের বদলে এক দিক থেকে তো রেল পথ উঠতে পারে!

—ঠিক বলেছেন।

বলে ভদ্রলোক মনে মনে কিছু হিসাব করলেন। তারপরে বললেন : হাসান থেকে রেলপথ আসাই সব চেয়ে সুবিধা। দূরত্বও কম, আর ট্রেনেরও সুবিধা হবে। রাতে খেয়ে দেয়ে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ধরলে সকাল বেলায় মার্কারায় পৌঁছানো যাবে।

আমি হেসে বললাম : চাই কি, গোয়া থেকেও আপনি থ্রু ট্রেনে মার্কারায় আসতে পারবেন।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : আমার কপালে কি সুখ আছে!

—কেন নেই?

—বয়স তো হল! দেশের এ সব উন্নতি কি আর দেখে যেতে পারব! মোটর বাসের ব্যাপারটাই দেখুন না। ব্যাঙ্গালোর থেকে থ্রু বাস উডিপি পর্যন্ত যাচ্ছে। গোয়া থেকে যাচ্ছে বম্বে। কিন্তু উডিপি থেকে থ্রু বাস গোয়ায় যাচ্ছে না, যাচ্ছে কারোয়ার থেকে।

তারপরে ভদ্রলোক আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন : আপনি বুঝি অনেক দূর থেকে আসছেন?

নিজের পরিচয় দেবার সময় আমি পাটনার কথা বলেছিলাম। ভদ্রলোক বোধহয় দূরত্ব ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাই হেসে বললাম : তা দু হাজার মাইল হবে।

—দু হাজার মাইল!

বলে ভদ্রলোক তাঁর চোখ কপালে তুলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম : পাটনা থেকে ম্যাঙ্গালোরের দূরত্ব এর কম নয়।

—মার্কারায় থাকবেন তো কয়েক দিন!

হেসে বললাম: একটি দিন থাকতে পারলেই ভাগ্যবান মনে করব।

—মাত্র এক দিন!

এই দুটি শব্দে ভদ্রলোক তাঁর বিপুল বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আর আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে আমার ফেরার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। নির্দিষ্ট দিনে আমাকে ম্যাড্রাস থেকে কলকাতার গাড়ি ধরতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন: তবে আপনি কুর্গের কী দেখবেন বলুন!

বললাম: যতটুকু দেখতে পাই, ততটুকুই উপরি লাভ মনে করব। এই যে আপনাদের দেখছি, দেখছি নতুন পথ-ঘাট—এও তো লাভ!

—হুঁ।

বলে ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নীরবে রইলেন। তারপরে বললেন: আমি ভাবছি, আপনাকে আমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাব। গরিবের বাড়ি, কষ্ট হবে আপনার। কিন্তু আনন্দও যে পাবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: মার্কারায় আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব আছেন?

আমি বললাম: না।

—তবে সেখানে উঠবেন কোথায়?

—কোন হোটেলে উঠব।

আহত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: ছি-ছি, আমাদের অপমান হবে তাতে, বাইরে থেকে অতিথি এসে হোটেলে উঠবে!

আমি আশ্চর্য হলাম তাঁর কথা শুনে। আর ভদ্রলোক আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে কুর্গের অধিবাসীরা খুবই অতিথি বৎসল। কারও বাড়িতে গেলেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে।

তারপরে নিজের কথাও বললেন: আমাকে দেখে এ দেশের

লোকের বিচার করবেন না। দীর্ঘ দিন বাইরে থেকে আমার সব কিছুই বদলে গেছে। আমি গোয়ার মানুষ, না কুর্গের, না বললে এখন আর কেউ তা বুঝতে পারবে না।

বলে হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম: আমাদের দেখেও বুঝতে পারবেন না, আমরা কোন্ রাজ্যের লোক।

ভদ্রলোক বললেন: এই জন্যেই আপনাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। একবার আমাদের সমাজটা দেখে গেলে আপনার চিরকাল মনে থাকবে।

মার্কারা শহরে ভদ্রলোকের বাড়ি হলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু গ্রামে তাঁর বাড়িতে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সৌজন্য বাঁচিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম: হাতে সময় থাকলে—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলাম না। আমাদের বাস একটা শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম তাই দেখে। এ তো মার্কারা নয়! এত তাড়াতাড়ি আমরা মার্কারায় পৌঁছব না। তাছাড়া কোন পাহাড়ও আমরা অতিক্রম করি নি। এ তবে কোন্ শহর! চোখে কৌতূহল নিয়ে আমি ঘরবাড়ি দোকানপাট ও লোকজনের দিকে তাকাতেই আইয়াপ্পা বললেন: না না, সময়ের অজুহাত দেবেন না। এখন চলুন আমার সঙ্গে। যতটুকু সময় থাকতে পারেন, ততটুকুই থাকবেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: এখানেই নামতে হবে নাকি?

ভদ্রলোকও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: পুত্তুরে নামবেন কেন!

এ জায়গায় নাম বুঝি পুত্তুর!

বলে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম।

আইয়াপ্পাও শ্রান্ত ভাবে জবাব দিলেন: এই অঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ জায়গা।

আমাদের বাস এসে বাজারের ভিতরে ঢুকল। আরও দু এক-খানি বাস দেখে বুঝতে পারলাম যে এইখানেই বাস স্ট্যাণ্ড। যাত্রীরা নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন।

আইয়াপ্পা সোজা হয়ে বসে বললেন: সকালে কি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন?

বললাম: না, সে সুযোগ পাই নি।

বাস দাঁড়াতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: তবে আসুন।

কিন্তু বাস থেকে নামতে আমাদের সময় লাগল। দরজা একটি, আর নামছে সব যাত্রী। ধীরে ধীরে এগিয়ে নামতে হচ্ছে। হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলি সবই কাছাকাছি। বাস থেকে নেমে পাশেই একটা রেস্তোরাঁয় আমরা ঢুকে পড়লাম।

খুব ব্যস্ত জায়গা। বহু যাত্রী। আয়োজনও প্রচুর। আইয়াপ্পার হুকুমে আমাদের ব্রেকফাস্ট এল। ইড্‌লি বড়া ও কফি। নারকেলের চাট্‌নি দিয়ে ইড্‌লি খেতে হয়। প্রথমে একটু কেমন যেন লাগে। পরে ঠিক হয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত মন্দ লাগে না। এমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন যে খেয়ে তৃপ্তিও পাওয়া যায়।

খেতে খেতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: গোয়া দেখেছেন?

বললাম: না।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন: দেখেন নি তো! একবার আসবেন গোয়ায়। আমার কুঁড়েতেই উঠবেন। ঠিকানা আপনাকে দিয়ে দেব।

তারপরে বড়ায় একটা কামড় দিয়ে বললেন: অমন সুন্দর জায়গা আপনি আর কোথাও দেখেছেন কিনা জানি না। সমুদ্র আছে, পাহাড় আছে, আবার চওড়া নদীও আছে। সকালে পাহাড়ে উঠুন স্বাস্থ্যের জন্যে, আর বিকেলে নদীর ধারে বা সমুদ্রের বালির উপরে গিয়ে বসুন। আর যদি পানের অভ্যাস থাকে তো গোয়া আপনার কাছে স্বর্গ।

—পানের অভ্যাস!

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন ঃ বুঝতে পারলেন না বুঝি! ড্রিঙ্ক্‌স্‌। গোয়ায় ড্রিঙ্ক্‌স্‌ খুব সস্তা। আগে তো এক টাকায় এক বোতল ছিল, এখন ছ-সাত টাকায় বোতল পাবেন। ফেনীর বোতল।

—ফেনী আবার কী?

ভদ্রলোক তেমনি হাসতে হাসতেই বললেন ঃ দেশী মদ, কাজু থেকে তৈরি হয়। যে কাজু খান তার থেকে নয়। কাজুর ফল হয়। সেই ফল থেকে তৈরি মদ। মন্দ না, বুঝলেন! একবার মুখে রুচলে অন্য জিনিষ আপনার ভাল লাগবে না।

কাজুর ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আমরা যে কাজু খাই, সে তবে কী জিনিষ?

—কাজুর বীজ। ফলের শাঁস থেকে হয় মদ।

ধীরে ধীরে কফি খেতে খেতে বললেন ঃ বম্বের বড় মানুষদের জানেন তো! এক দিন ছুটি পেলেই গোয়ায় ছুটে আসবে নিজের গাড়িতে! আকণ্ঠ পান করে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকবে সারা রাত। আমাদের বেশ ব্যবসা হয় তখন। টেলিফোনে মক্কেলরা খবর দেয়—

যাত্রীরা উঠে যাচ্ছিলেন দেখে আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। বাস এখানে কতক্ষণ দাঁড়ায় জানি না। ছেড়ে গেলেই বিপদ। আর জিনিষপত্র এমন ভাবে ফেলে এসেছি যে চুরি যেতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোকের কোন ভাবনা নেই দেখলাম। আমি অন্যমনস্ক হয়েছি কেন তা বোঝবার চেষ্টা করে বললেন ঃ কী দেখছেন?

সত্যি কথাই বললাম তাঁকে। কিন্তু তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ না না, কোন ভাবনা নেই আপনার। বাস এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়।

বললাম ঃ আমরা তো অনেকক্ষণ আগেই নেমেছি।

বলে এগিয়ে গিয়ে দুজনের পয়সাই আমি মিটিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক কফিতে বার কয়েক চুমুক দিয়ে বললেন : আমরা এ পথে চলাচল করে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গাড়িতে না উঠলে গাড়ি ছাড়বে না।

আইয়াপ্পা মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন তা পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম। কফির পাত্রটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করেই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : একি, আপনি পয়সা দিলেন কেন ?

বলতে বলতে ছুটে গিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে বাসে উঠে দেখলাম যে যাত্রীরা তখন প্রায় সবাই এসে গেছেন। অপেক্ষা হচ্ছে ড্রাইভারের জন্যে।

ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বললেন : দেখলেন তো !

কিন্তু পরের মুহূর্তেই বাসের হর্ন শুনে চমকে উঠলাম। ড্রাইভার কখন এসে উঠে বসেছিল দেখতে পাই নি। পিছনের দিকে এক বার চেয়ে কণ্ডাক্টারকে দেখে নিয়েই যাত্রা শুরু করল। বাসের দরজা বন্ধ হল তার পরে।

আমিও ভদ্রলোককে বললাম : দেখলেন তো !

এ কথার উত্তর তিনি আর দিলেন না।

দেখতে দেখতে আমরা পুত্তুর শহর ছাড়িয়ে গেলাম।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের তখন অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে উঠছে উপরে। অরণ্য গভীর নয়, কিন্তু কিসের অরণ্য তা বুঝতে পারছি না। এই সব পাহাড়ী পথ আমার কাছে একই রকম মনে হয়। গাছপালার তারতম্য হয় তো কিছু আছে। কিন্তু সাধারণ দৃশ্য কতকটা একই রকম। অন্তত কোন পাহাড়ী পথের দৃশ্য দেখে আমি এখনও বুঝতে পারি না যে সেটা কোন্ পাহাড়। তবে কোন বিশেষ জায়গার ছবি দেখলে চিনতে পারি। কোন

একটি বিশেষ বস্তু এই চেনার ব্যাপারে সহায়তা করে। আমি এখন নিঃশব্দে এই পথ অতিক্রম করে চলেছিলাম।

পাশ থেকে আইয়াপ্পা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন: অমন মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন বলুন তো!

বললাম: কেরালায় শুনেছি রবারের চাষ হয়। এখানেও হয় কিনা তাই দেখছি।

ভদ্রলোক বললেন: উঁহু, এখানে আপনি শুধু কফির চাষ দেখতে পাবেন।

উত্তর বাঙলায় আমি চায়ের বাগান দেখেছি। শক্ত ঝাড়ালো গাছগুলোকে কড়া করে ছেঁটে রাখা হয়। সমতল ভূমিতে চা বাগান আছে, আছে পাহাড়ের গায়েও। পিঠে ঝাঁকা বেঁধে মেয়ে কুলিরা পাতা সংগ্রহ করে। তার ছবিও দেখেছি। কিন্তু কফির বাগানের কোন ছবি আমি দেখি নি। তাই কফির কোন বাগান দেখতে পাওয়া যায় কিনা, সে দিকে চোখ রেখেছিলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক বললেন: রাস্তার ধারে তো কফির বাগান দেখতে পাবেন না। আর কাছে না গেলে বুঝতেও পারবেন না কিছু।

তার পরেই বললেন: সেইজন্যেই তো আপনাকে ডাকছি। গরিবের বাড়ি এলে কফির গাছ আপাকে দেখিয়ে দেব।

সেই আগ্রহ, সেই সরল অনুরোধ। কিন্তু তবু আমি রাজী হতে পারলাম না। বললাম: পরের বারে এলে কয়েক দিন থাকব আপনার কাছে।

—না না, পরের বারে নয়। তখন আমি এখানে থাকব না গোয়ায়, তা তো জানা নেই। এইবারেই চলুন কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আর এরই মধ্যে আমি আপনাকে আরও অনেক কিছু দেখিয়ে দেব।

আমি আগ্রহ সহকারে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন: আপনারা ভাবেন যে কেরালা থেকেই সব

মশলা রপ্তানি হয়। কিন্তু আমাদের দেশ থেকেও যে যায় তা জানেন না। গোল মরিচ আর ছোট এলাচের চাষ হয় এ দেশে। আমি শখ করে আমার বাড়িতে লাগিয়েছি।

এই সব গাছ দেখবার প্রবল শখ ছিল আমার। গাছ কী রকমের হয়, আর তার ফল হয় কেমন, তা জানতে চাইবার আগেই ভদ্রলোক বললেনঃ গত বছর এলাচের ব্যবসায়ীরা খুব লাভ করেছে। এক কিলো এলাচ অনেকে একশো টাকার বেশি দামে বিক্রি করেছে।

এলাচের দামের সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি তাই নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেনঃ কিছু বুঝতে পারলেন না বুঝি?

বললামঃ না।

—এ বছরের দাম বললেই বুঝতে পারবেন। এ বছরের দাম ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে উঠানামা করছে।

আমি যত দূর জানি, বাঙলায় বড়লোক ছটাক হিসাবে ছোট এলাচ কিনত। আর সাধারণ লোকে কিনত তোলার হিসেবে। গরম মশলার সঙ্গে এই ছোট এলাচের ব্যবহার। এখন এমনই দুর্মূল্য হয়েছে এ জিনিষ যে পয়সার অভাবে অনেকে গরম মশলাই বর্জন করেছে। আর শীতের সময় ধনে পাতা দিয়ে গরম মশলার কাজ চালাচ্ছে।

কিন্তু আইয়াপ্পা থামলেন না, বললেনঃ আমার বাড়ি যাবার রাস্তাটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললামঃ আপনি কি এইখানে নামবেন নাকি?

সহাস্যে ভদ্রলোক বললেনঃ না। এখানে নামলে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে পারব না।

—তবে কী করবেন ?

—মার্কারা গিয়ে নামব। আর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে উঠব ভাগমণ্ডলের বাসে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম ঃ আমাকে সঙ্গে নিয়ে !

আমার চোখে বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক খুশী হলেন, বললেন ঃ মার্কারায় এলে আপনাকে তলাকাবেরী দেখতেই হবে।

রঙ্গরাজনের কাছে আমি এই জায়গার নাম শুনেছিলাম। তাই আমি চুপ করে রইলাম।

তলাকাবেরীর নাম শোনেন নি !

বলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন।

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম ঃ শুনেছি।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন ঃ কাবেরী নদীর উৎস হল তলাকাবেরী। ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের গায়ে এই তীর্থস্থান। কুর্গের একমাত্র তীর্থস্থান। কিন্তু তীর্থের চেয়েও এর সৌন্দর্যের আকর্ষণ বেশি। তলা কাবেরী না দেখে কুর্গ থেকে কেউ ফেরে না।

—সত্যি !

খুশী হয়ে ভদ্রলোক বললেন ঃ আর তলা কাবেরী যেতে হলে ভাগমণ্ডলের উপর দিয়েই আপনাকে যেতে হবে। মানে গরীবের বাড়ির উপর দিয়ে।

বলেই তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

আর আমি পথের দিকে চেয়ে দেখলাম যে ডান হাতে একটি পথ বেরিয়ে ঘুরে গেছে। ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন ঃ দেখলেন এই পথটা ?

—দেখলাম।

এই পথটাই ভাগমণ্ডলের উপর দিয়ে মার্কারা যাবে। মার্কারা থেকে ভাগমণ্ডল প্রায় কুড়ি মাইল। মার্কারায় নেমে

আমাদের আবার এই পথেই আসতে হবে, ফিরতেও হবে এই পথে।

তারপরেই বললেন: বুঝলেন, বাসের অভাব আমাদের হবে না। প্রতি দিন এত যাত্রী এ দিকে যাতায়াত করে যে ফেরার জন্তে আপনার একেবারেই ভাবতে হবে না। আমার বাড়িতে নেমে ভাগমণ্ডলেশ্বর শিব দর্শন করে আসবেন। তারপরে রাতে বিশ্রাম করে ভোরবেলায় পাহাড়ে উঠে তলাকাবেরী দর্শন করবেন।

আমি বললাম: দেখবার কী আছে?

—বলেছি তো, সৌন্দর্যই এখানে বড়। তারপরে আপনার তীর্থের কথা মনে পড়বে। সুন্দর একটি কুণ্ড আছে। আর কাবেরীর মন্দির। কুণ্ডে স্নান করে কাবেরী মায়ের দর্শন করে নিচে নেমে আসবেন।

এই সব জায়গার প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। বললাম: ভারতবর্ষের কোন্ জায়গার সঙ্গে এর তুলনা করবেন?

—তুলনা! এ আমার পক্ষে অসম্ভব কাজ।

—কেন?

—এই বিরাট দেশের আমরা কতটুকু দেখেছি যে তুলনা করব! সত্যি বলতে কি, বাড়ির কাছে বলেই এ জায়গা দেখবার সুযোগ হয়েছে। দূরে হলে কি আর ভাগ্যে ঘটত! গোয়ার কথাই ধরুন না, সে দেশেও নাকি অনেক সুন্দর জায়গা আছে। কিন্তু না, আমার দৌড় হল পানাজি পর্যন্ত।

কেন জানি না, আমার মনে হল যে এই তলাকাবেরী দেখে যাওয়া খুবই উচিত হবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলে হয়তো নিজেই গাইড হয়ে সব কিছু দেখিয়ে আনবেন। একটি রাত তাঁর বাড়িতে থাকতে হতে পারে, কিংবা চেষ্টা করে আজই দেখে আসতে পারলে রাতে থাকবারও দরকার হবে না। কাল সকালে না পারি, দুপুরে আমি মার্কারা ত্যাগ করতে পারব, আর মাইশোর থেকে ধরতে

পারব রাতের গাড়ি। তাহলে ক্ষতি নেই, ব্যাঙ্গালোর থেকে সকালের গাড়ি ধরে ম্যাড্রাস পৌঁছে রাতের মেল ধরা সম্ভব হবে।

জানি না আমার মন কখন তলাকাবেরী দেখার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক বোধ হয় আর একবার বললেই আমি রাজী হয়ে যেতাম। আর নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি সেই সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক বললেন : আমরা প্রায় মার্কারার কাছাকাছি এসে গেছি। ডান দিকে একটু নজর রাখবেন।

তাঁর কথাতেই বুঝতে পারলাম যে আমরা এখন পাহাড়ের অনেক উপরে উঠে এসেছি। বাতাসে আর একটুও উত্তাপ নেই, বেশ স্নিগ্ধ বাতাস। পথঘাটও পরিচ্ছন্ন। দূরে দূরে একটি দুটি ঘর-বাড়িও দেখা যাচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন : এইবার লক্ষ্য করুন।

ডান দিকে আমি ফিরে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন : প্রথমে ভাগমণ্ডলের রাস্তা দেখতে পাবেন। তারপরে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তা। তারপরেই দেখতে পাবেন মাইসোর রোড। মার্কারা শহর সেখান থেকেই জমজমাট হয়ে উঠেছে।

এই সব পেরিয়ে শহরে পৌঁছতে আমাদের বেশি সময় লাগল না।

একটি সুন্দর পাহাড়ী শহর। পরিচ্ছন্ন চারিদিক। দোকান-পাট হোটেল রেস্তোরাঁ। খানিকটা উঠে গিয়ে আবার গড়িয়ে নামতে লাগল।

বাঁ দিকের একটি পথ দেখিয়ে আইয়াপ্পা বললেন : 'এখান থেকেই টুরিস্ট বাংলোর দিকে যেতে হয়। রাজাস্ সীটও এই দিকে।

তারপর বাঁ দিকের আর একটা পথ দেখিয়ে বললেন : এই পথ ধরলে ফোর্ট। এর ভিতরে এখন সরকারী দপ্তর।

গড়গড় করে আমরা নিচে নামছিলাম। ভদ্রলোক বলে চললেনঃ আর বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই মার্কারার সব হোটেল রেস্তোরাঁ।

বলে ভদ্রলোক সতর্ক ভাবে সামনের দিকে তাকালেন।

বাস স্ট্যাণ্ড আমি সামনেই দেখতে পেলাম। আর একখানা বাস ছাড়ছে বলে মনে হল। ভদ্রলোক তাঁর ব্যাগটা র‍্যাক থেকে নামিয়ে কোলের উপরে রেখে বললেনঃ বোধহয় ভাগ মণ্ডলেরই বাস, বুঝলেন!

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ালেন, আর চলতি বাসেই এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে।

বাস থামবার পরে আমার দিকে আর তাকিয়ে দেখলেন না। লাফিয়ে নেমে অন্য বাসে গিয়ে উঠে পড়লেন। সে বাসের দরজার কাছে কিছু যাত্রী দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যেই হারিয়ে গেলেন তিনি।

ভাবলাম, ভদ্রলোককে একটা নমস্কার করি। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। সামনের যাত্রীদের নামবার পরে আমি যখন মার্কারার মাটিতে পা দিলাম, ভাগমণ্ডলের বাস তখন ছেড়ে চলে গেছে।

মার্কারার বাস স্ট্যাণ্ডে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কর্তব্য আমি স্থির করে ফেললাম। কাছেই কোনও হোটেলে উঠে এই বেলাতেই দেখে নেব এই পাহাড়ী শহরটা। তারপরে বিকেলের বাস ধরে চলে যাব মাইসোর। কিন্তু কোন্ হোটেলে উঠব!

বাসের ছাদ থেকে বিছানা আমি নামিয়ে নিয়েছিলাম। স্যুটকেসটা নিজেই নামিয়েছিলাম বাস থেকে। কুলি আমার হুকুমের অপেক্ষা করছে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম: ভাল হোটেল কোন্টা?

সে কোন উত্তর দিল না, নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

একজন এগিয়ে এসে বললেন: ও বোবা। কী জিজ্ঞেস করেছেন ওকে?

বললাম: একটা ভাল হোটেলের খবর চেয়েছি।

—ভাল হোটেল!

বলে সেই লোকটি আঙুল দিয়ে একটা নতুন বাড়ি দেখিয়ে দিলেন। বললেন: মার্কারায় এখন এইটিই সব চেয়ে ভাল হোটেল।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটু নেমে গিয়ে ডান হাতে এই হোটেল। ভারি সুন্দর দেখতে। দূর থেকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম: ঐখানেই যাব।

বোবা কুলি বুঝতে পারল আমার কথা। মালপত্র নিয়ে সেও আমাকে অনুসরণ করল।

পছন্দ মতো একটা ঘরে জিনিষপত্র রেখে আবার আমি বাস-স্ট্যাণ্ডে ফিরে এলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে এই জায়গাটাই

মার্কারার প্রাণকেন্দ্র। শুধু বাস নয়, অনেক ট্যাক্সিও দেখেছি দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের ধার ঘিরে আছে অনেক দোকান পাট। তার মধ্যে বই এর দোকানও দেখেছি একটা।

প্রধান রাজপথ এইখানেই শেষ হয় নি, শহরের মাঝখান দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে। আর একটি পথ নেমে গেছে আমার হোটেলের সামনে দিয়ে। এইখানে দাঁড়িয়ে এর বেশি আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

বইএর দোকানের দিকেই আমি এগিয়ে গেলাম। একখানা গাইড বই পেলে মন্দ হয় না। হাতে ঐ রকমের কিছু থাকলে গাইড না হলেও চলে। বই দেখেই মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। তাই একখানা গাইড বই এর অনুসন্ধান আমি করলাম।

যে লোকটি দোকানে বসেছে, তার উৎসাহ নিতান্তই কম। বলল ঃ না, সে ধরনের কোন বই নেই।

—অন্য কোথাও পাওয়া যাবে?

—না।

বলে লোকটি মুখ ফিরিয়ে নিল।

কুর্গের কোডাভাদের কথা আমার মনে পড়ল। তাদের সম্বন্ধে কিছুই আমার জানা নেই। নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের সম্বন্ধে বই পড়ে কিছু জেনেছি। আর ছবিও দেখেছি তাদের কুঁড়ে ঘরের। কিন্তু তাদের দেখতে হলে উটি শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে যেতে হয়। কোডাভারা কি মার্কারার কাছাকাছি থাকে! কফি বা এলাচের বাগানে গেলে কি তাদের দেখতে পাওয়া যাবে!

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়ে একখানা সাময়িক পত্রের পাতা উল্টে দেখছিলেন। তাঁকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার প্রশ্নটা ভাল করে বোঝবার আগেই পিছন থেকে একটি মেয়ে প্রশ্ন করল ঃ আপনি কী জানতে চান বলুন তো!

পিছন ফিরে আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। কুড়ি বাইশ বছরের একটি সুশ্রী মেয়ে। খুব সপ্রতিভ। অত্যন্ত সহজ ভাবে আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। একটু আমতা আমতা করে বললাম: কী জানতে চাই!

মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল: কী জানতে চেয়েছেন এঁদের কাছে?

বললাম: এক বেলার জন্যে এই শহরে নেমেছি, তাড়াতাড়ি সব কিছু দেখে নিতে চাই।

—সব কিছু মানে?

বললাম: শহরে যদি দ্রষ্টব্য কিছু থাকে—আর—

—বলুন।

—কফির বাগান, এলাচ বা লবঙ্গের গাছ, আর—

—আর কী?

—সম্ভব হলে কুর্গের কোডাভাদেরও দেখতে চাই।

মেয়েটি সকৌতুকে একটুখানি হাসল, বলল: সবই দেখতে পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে!

বলে আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম।

মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়ে নিজের হাতের ঘড়িটি একবার দেখল। বলল: কতটা সময় আপনার হাতে আছে?

বললাম: এখানে আমার কোন কাজ নেই।

—আপনি একা, না সঙ্গে আর কেউ আছেন?

হেসে বললাম: সঙ্গী নেই বলেই তো অসহায় বোধ করছি।

মেয়েটিও হেসে বলল: তবে কুর্গে আপনার সঙ্গীর অভাব হবে না। আমার নাম অনুরাধা, অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম বলে এই নাম হয়েছে।

বললাম ঃ এ নাম বাঙলাতেও খুব প্রচলিত।

এই সঙ্গে নিজের নামটাও বললাম।

খান কয়েক সাময়িক পত্র কিনল অনুরাধা, তারপরে একখানা গাড়ির কাছে ডেকে আনল। হাতের ব্যাগ থেকে চাবি বার করে গাড়ির দরজা খুলল। সাময়িক পত্রগুলো রেখে অন্য ধারের দরজা খুলে বলল ঃ আসুন।

এই মেয়েটি যে পাহাড়ী শহর মার্কারায় নিজে গাড়ি চালাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কলকাতার পথে মেয়েরা গাড়ি চালাচ্ছে অন্য শহরেও। মেয়েদের নির্ভয়ে গাড়ি চালানো এখন হামেশাই দেখি। কিন্তু এই পাহাড়ী শহরে এমনটি আমি আশা করি নি। আর সত্যি কথা বলতে কি, মেয়ে চালকের গাড়িতে আমি এর আগে কখনও চাপি নি। অনুরাধা আমার দ্বিধা দেখে হেসে বলল ঃ ভয় পাচ্ছেন নাকি!

ভয় পেলেও সে কথা আমি স্বীকার করলাম না। তার পাশে উঠে বসে বললাম ঃ আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলেই দ্বিধা করছি।

অনুরাধা হেসে বলল ঃ কুর্গের কোডাভা দেখতে হলে একজনকে কষ্ট আপনার দিতেই হবে। নিজে সে কাজ পারবেন না।

বলে হাসতে হাসতেই সে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বলল ঃ আগে আপনাকে শহরটা দেখিয়ে দিই, তারপরে কোডাভা দেখাব।

মার্কারায় এমন একটি সঙ্গীর সঙ্গে যে সব দেখতে পাব, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তবু আমি নিঃশব্দে তার প্রস্তাব মেনে নিলাম। যে ভদ্রলোক আমাকে সব দেখাতে চেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তার কথাও আমি ভুলে গেলাম।

পথ দু দিকেই উপরে উঠেছে। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, অনুরাধা সেই দিকেই গাড়ি চালাল। তার গাড়ি চালাবার সাবলীল ভঙ্গি দেখে আমি কিছু সাহস পেলাম, বললাম ঃ নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে।

—দেখেছেন বুঝি ?

বলে অনুরাধা আমার দিকে এক মুহূর্তের জন্যে ফিরে তাকাল।

বললাম ঃ না, দেখি নি তাদের। তবে ছবি দেখেছি, আর পড়েছি তাদের কথা।

অনুরাধা নীরবে ছিল। তাই দেখে বললাম ঃ ভারি অদ্ভুত জাত, আর অদ্ভুত তাদের জীবন যাত্রা। বিংশ শতাব্দীতেও যে এ রকম জাত আছে ভাবতে পারা যায় না। দেখেন নি আপনি ?

—দেখেছি।

—তবেই বলুন। ঐ সব কুঁড়ের ভেতর কি এ যুগের মানুষ থাকতে পারে! কত নিচু কুঁড়ে, ঠিক যেন গরুর গাড়ির ছই। দরজাগুলোও এমনি ছোট যে নিশ্চয়ই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। আর জানালাও তো কোন ধারে নেই! কী ভাবে তারা এই ঘরের ভেতর থাকে, ভাবতে পারেন!

অনুরাধা বলল ঃ এই ভাবেই তো থাকছে।

—কিন্তু একে থাকা বলে না।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কুর্গের কোডাভারাও কি এই ভাবেই আছে ?

বলে আমি প্রচুর কৌতূহল নিয়ে অনুরাধার মুখের দিকে তাকালাম।

চকিতে অনুরাধা আমার দিকে একবার চেয়ে দেখল। তার পরেই পালটা প্রশ্ন করল ঃ কোডাভাদের দেখতেই বুঝি কুর্গে এসেছেন ?

বললাম ঃ ঠিক ধরেছেন। এখানে আমার প্রধান দ্রষ্টব্য হল কোডাভা। তারপরে কফির চাষ। সম্ভব হলে গোল মরিচ আর এলাচের চাষও দেখে যাব।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে অনুরাধার দৃষ্টি কৌতুকে উচ্ছলিত হয়ে উঠল। বলল ঃ চমৎকার আইডিয়া। আমি আপনাকে সব দেখিয়ে দেব।

—কিন্তু—

—কিন্তু কী ?

—আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে আমি কিছুতেই খুশী হতে পারছি না।

অনুরাধা হেসে বলল: বলেছি তো, একজনের সাহায্য আপনাকে নিতেই হত। না হয় আমিই আপনার ভার নিলাম।

চড়াই পথ ধরে আমরা উপরের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ডান দিকের রাস্তা ধরতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

অনুরাধা বলল: প্রথমে রাজাস সীটে চলুন।

রাজাস্ সীট শুনে ভেবেছিলাম আমরা কুর্গের রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পর দেখলাম যে আমরা একটা নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় এসেছি। শহরের প্রধান রাজপথ থেকে একটি রাস্তা ডান হাতে বেরিয়ে টুরিষ্ট বাংলোকে বাম হাতে ফেলে এই জায়গায় পৌঁছল ? গাড়ি থামিয়ে অনুরাধা নেমে পড়ল। আমিও নামলাম।

পাহাড়ের একটা ধারে এসে আমরা পৌঁছেছি। নির্জন এই জায়গা। শুধু একজন বৃদ্ধকে দেখলাম একটি চারকোণা গৃহের চাতালে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দেখবার আর কিছু নেই। আশ্চর্য হয়ে বললাম: এরই নাম রাজাস সীট !

অনুরাধা হেসে বলল: এই যে ছোট্ট বাড়িটি দেখছেন, এরই নাম রাজাস সীট। কুর্গে যখন স্বাধীন রাজা ছিলেন, তখন বোধহয় তাঁরা এসে এইখানে বসতেন।

—এখন ?

—এখন সবাই চারি দিকের শোভা দেখতে এইখানে আসে। বলে আমাকে নিয়ে অনুরাধা পাহাড়ের ধারে এগিয়ে গেল।

এবারে আমি নিচের দৃশ্য দেখতে পেলাম। অপরূপ দৃশ্য। স্তরে স্তরে পাহাড় নেমে গেছে নিচের সমতল ভূমিতে। কাবেরী নদীর উৎস যে কুর্গের পাহাড়ে, তা আগেই জেনেছি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম: এখান থেকে কাবেরী নদী দেখা যায় না?

অনুরাধা বলল: কাবেরী দেখতে হলে যেতে হবে তলা কাবেরী। ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের গায়ে তার উৎস আপনি দেখতে পাবেন।

সে জায়গা যে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে, সে কথাও আমি জেনেছিলাম। তাই বললাম: এ যাত্রায় সে জায়গা আর দেখা হবে না।

অনুরাধা সকৌতুকে বলল: কোডাভা দেখতে পেলেই তো আপনার এ যাত্রার শখ পূর্ণ হবে! সে আমি দেখিয়ে দেব।

বলে হাসতে হাসতে তার গাড়িতে ফিরে এল।

আমি তার হাসির অর্থ তখন বুঝতে পারি নি। বুঝেছিলাম পরে, আর আমিও হেসেছিলাম নিজের অজ্ঞতার জন্যে। না হেসে উপায় ছিল না।

গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে অনুরাধা বলল: মন্দির দেখবার উৎসাহ বোধহয় আপনার নেই!

বললাম: এ খুব কঠিন প্রশ্ন।

কেন?

বলে অনুরাধা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম: এ দেশে নাকি এমন অনেক মন্দির আছে যা না দেখলে জীবন ব্যর্থ মনে হবে।

আমার কথায় অনুরাধা যেন নিশ্চিন্ত হল। গাড়ির মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল: এ মন্দিরটি সে রকম মন্দির নয়।

বলে বাঁ দিকের একটি ছোট্ট অনাদৃত মন্দির দেখিয়ে দিল, বলল: দেবীর মন্দির।

একই রাস্তা ধরে ফেরার পথ। সেই পথ ধরে নেমে আসার সময় অনুরাধা বলল: মন্দির দেখবার ইচ্ছা থাকলে আপনাকে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যেতে পারি। ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দির।

সে মন্দির কত দূরে জানি না। আর মন্দির দেখতে গেলে বড় কিছু হারাতে হবে কিনা, তাও বুঝতে পারি না। তাই কোন উত্তর দিলাম না।

অনুরাধা বলল: ও পথ ধরে ঘুরে যেতে বেশি সময় লাগবে না। ফোর্ট দেখে ফেরার সময় ঐ পথেই ঘুরে যাব।

আমি সৌজন্য প্রকাশের জন্যে বললাম: আপনি আমার জন্যে অকারণে কষ্ট স্বীকার করছেন।

উত্তরে অনুরাধা বলল: আপনি টোডাভাদের দেখতে এত দূরে এসেছেন! পাছে তাদের দেখবার পরে হতাশ হন, তাই এ সব দেখাচ্ছি।

আমি বললাম: কিছুতেই হতাশ হব না। দেখছেন না, কেমন চারি ধারে চোখ রেখেছি। ওদের দেখলেই আমি চিনতে পারব।

অনুরাধা সকৌতুকে বলল: সত্যি!

বললাম: পারব না চিনতে! অবশ্য নীলগিরি পাহাড়ের টোডাদের চেনা আরও সোজা। কাউকে চিনিয়ে দেবার দরকারই হবে না।

—কেন?

—পুরুষদের চাপদাড়ি আর গায়ের চাদর দেখেই চেনা যাবে।

—মেয়েদের চিনবেন কী করে?

বলে অনুরাধা আমার দিকে তাকাল। তার মুখের হাসিটি সারাক্ষণ লেগে আছে।

সগৌরবে বললাম: মেয়েরাও এক রকমের ডোরাকাটা চাদর

গায়ে দেয়। ছবি দেখেছি তো। চিনতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।

অনুরাধা কোন উত্তর দিল না। কিন্তু আমি তাকে সাগ্রহে বোঝালাম: অনেক জাতের আদিবাসী দেখেছি। প্রত্যেকেরই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে দেখলেই চেনা যায়।

তখন আমরা প্রধান রাজপথের উপরে এসে পড়েছিলাম। বাঁ হাতে মোড় নিয়ে অনুরাধা আবার উপরে উঠতে লাগল। উঁচু দেওয়ালের ধার দিয়ে এই পথ। একটুখানি এগিয়েই ডান দিকে ফিরে আমরা একটা বিরাট এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

অনেকগুলো ছোট বড় ঘরবাড়ি এখানে। অনেক লোকজন। অনুরাধা সোজা এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় গাড়ি দাঁড় করাল। তারপরে গাড়ি থেকে নেমে বলল: এই হল কুর্গের দুর্গ। এখন সরকারী অফিস হয়েছে এইখানে। আপনি ঐ পাথরের হাতি দুটো দেখুন, তারপরে ঐ পথে বেরিয়ে গিয়ে ফোর্টের গেটও দেখে আসুন। গেটের পাশে গণেশের একটি ছোট মন্দির আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কী করবেন?

অনুরাধা বলল: অফিসের ভিতরে আমার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে টেলিফোন করব। কফির বাগান আর কোডাভাদের দেখবেন তো! একটা খবর দিয়ে গেলে দেখবার সুবিধা হবে। চাই কি, কোন কোডাভা পরিবারের সঙ্গে খাবার ব্যবস্থাও হতে পারে।

ভয়ে আমি আঁৎকে উঠলাম, বললাম: সর্বনাশ! ও কাজও করবেন না। ফিরে এসে আমরা হোটেলেই খাব।

অনুরাধা গম্ভীর ভাবে বলল: তা বোধহয় সম্ভব নয়।

—কেন?

—কোডাভাদের দেখতে গেলে তারা বোধহয় না খাইয়ে ছাড়বে না।

—কেন ?

—ভারি অতিথি বৎসল তারা।

এ কথা শুনে আমি আরও ভয় পেলাম। আদিবাসীদের সঙ্গে খাওয়ার একটা আতঙ্ক আছে। তারা কী খায় জানি নে। টোডারা মহিষ পালন করে শুনেছি, নিরীহ জাত তারা। কিন্তু কোডাভারা শুনেছি দুর্ধর্ষ জাত। মহিসুরের হায়দর আলিকেও হারিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য তার প্রতিশোধ নিয়েছিল টিপু সুলতান। ইতিহাসে পড়েছি যে ইংরেজের সঙ্গেও তারা লড়াই করেছে দীর্ঘ কাল। এরা কী খায়, আর কী না খায়, তা না জেনে এদের সঙ্গে খাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারি নে।

কিন্তু অনুরাধা তখন দপ্তরের দিকে এগিয়ে গেছে। ত্বরিত পদে এগিয়ে গিয়ে আমি তাকে বললাম ঃ তাহলে এক কাজ করা যাক।

—কী ?

বলে অনুরাধা ফিরে তাকাল।

বললাম ঃ কোডাভাদের দেখতে যাবার আগে হোটেলেই আমরা খাওয়া সেরে নেব।

—দেখা যাক।

বলে সে হাসতে হাসতে দপ্তরের ভিতরে ঢুকে গেল।

আমি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে বিরাট হাতি দুটো দেখলাম। গায়ের রঙ ঠিক হাতির মতোই। সিমেন্টের ঢালাই করা হাতি, না দুখানা বিরাট পাথর কেটে তৈরি, তা বুঝতে পারলাম না। ছবি নিলে সত্যিকার হাতি বলেই মনে হবে।

সেখান থেকে আমি একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ফোর্টের গেট এটি। শহর থেকে এই পথেই লোকজন যাতায়াত করে। কিন্তু গাড়ি আসে অন্য পথ ঘুরে। দুর্গের এই মজবুত

গেটের পাশেই গণেশের মন্দির। দরজা বন্ধ। বাহির থেকেই একটা প্রণাম করে ফিরে এলাম।

অনুরাধাও ফিরে আসছিল। বলল : দেখা হল?

তার মুখে খুশি-খুশি ভাব দেখে বললাম : ভাল ব্যবস্থা হয়েছে বুঝি?

অনুরাধা বলল : হ্যাঁ, উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি!

গাড়িতে উঠে আমি বললাম : একটা কাজ করলে ভাল হয় না?

—কী কাজ?

বলে অনুরাধা আমার দিকে একবার তাকিয়ে ফোর্ট থেকে বেরোবার পথ ধরল।

বললাম : শিবের মন্দির দেখে দুপুরের লাঞ্চ আমরা হোটেলেই সেরে নিই।

—ভয় পাচ্ছেন নাকি?

বলে অনুরাধা এমন ভাবে হাসল যে আমি লজ্জা পেলাম। আর এই প্রস্তাবে জোর করবার কোন সুযোগই পেলাম না।

শহরতলির মতো সরু পথ ধরে আমরা ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে এলাম। গেটের বাহিরে গাড়ি রেখে ভিতরে এসে দেখলাম একটা বিরাট পুষ্করিণী, তার মাঝে একটি ছোট মন্দিরের মতো। কিন্তু অনুরাধা বলল : ওটা মন্দির নয়, মন্দির এই ধারে।

বলে পুষ্করিণীর ধার দিয়ে হেঁটে অন্য ধারে এসে উপস্থিত হল। অনেকগুলি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটি দরজা, তার পরে মন্দিরের প্রাঙ্গণ। কোন প্রচলিত স্থাপত্য রীতির মন্দির নয়। এ একেবারে নূতন ধরণের। প্রশান্ত পরিবেশ।

মন্দিরের ভিতরে ঢুকে আমরা শিবকে প্রণাম করলাম। অল্প

বয়সের কয়েকজন তরুণকে দেখলাম পুজো দিতে। নানা বয়সের মেয়েও এসেছে কয়েকজন। অনুরাধার প্রণাম করার ঘটা দেখে মনে হল যে হাতে সময় থাকলে সেও পুজো দিয়ে যেত।

একটি অভূতপূর্ব গম্ভীর ভাব নিয়ে আমরা গাড়ির কাছে ফিরে এলাম। তারপর গাড়িতে এঁকে বেঁকে অনেকটা পথ এসে অনুরাধা আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি তো এই হোটেলে উঠেছেন বললেন ?

আমি একবার ডান ধারে তাকালাম, তারপর বাঁ ধারে। সত্যিই তো, এই হোটেলেই আমি উঠেছি।

কিন্তু অনুরাধা হোটেলের ভিতরে না ঢুকে উপরে বাস স্ট্যাণ্ডে উঠে এল। তারপরে ডান দিকে ফিরে বাজারের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: এবারে আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

অনুরাধা বলল: মার্কারায় আর একটি দেখবার জিনিস আছে। তার পাশ দিয়ে একটি কফির বাগানে যাব।

—মার্কারায় শুধু আর একটি দেখবার জিনিষ !

অনুরাধা বলল: এই ছোট পাহাড়ী শহরে আর কত জিনিস দেখবেন বলুন !

বাজারের পথ হঠাৎ উপরে উঠতে শুরু করেছে, আর অদ্ভুত দক্ষতায় অনুরাধা এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই আবার সমতল পথ পাওয়া গেল। আর আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম: দেখবার জিনিষটা কী ?

অনুরাধা বলল: রাজাদের সমাধি। পাশাপাশি দুটি সমাধি সৌধ রাস্তা থেকেই দেখতে পাবেন।

সত্যিই দেখতে পেলাম। সামনের পাহাড়ের উপরে এই সমাধি সৌধ দুটি গাড়ি থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

অনুরাধা বলল: কাছে যাবেন ?

বললাম : বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

—সেই ভাল।

বলে ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : ওদিকে যেতে না হলে সময় অনেকটা বাঁচবে।

আমি বললাম : মৃতের সমাধির চেয়ে জীবন্ত মানুষের জন্যে আমার আগ্রহ বেশি।

অনুরাধা বলল : কোডাভাদের দেখবার আগ্রহ বোধহয় সবচেয়ে বেশি!

বলে আবার সকৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে।

তখনও আমি এই কৌতুকের মানে বুঝতে পারি নি। তাই অনুরাধার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি হাসছেন আমার আগ্রহ দেখে?

অনুরাধা বলল : এই পথঘাট হাট বাজারে আপনি একজনও কোডাভা দেখতে পেলেন না, তাই না?

শহর আমরা তখন পিছনে ফেলে এসেছি। নির্জন পথ। কোন গাড়ি ঘোড়া নেই, কোন ঘর বাড়ি নেই। শুধু পাহাড় আর বন। তাই দেখে বললাম : কোডাভারাও বুঝি টোডাদের মতো শহরের বাইরে থাকে?

অনুরাধা তার গাড়ির গতি খুব বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলল : শহরেও থাকে।

বললাম : কই, দেখতে পেলাম না তো!

অনুরাধা হেসে বলল : ফেরবার সময় দেখতে পাবেন।

সহসা সে তার গাড়ির গতি মন্থর করল। একটা বন্ধ গেটের সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে বলল : গেটটা খুলতে পারবেন?

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে আমি গেটটা খুলে দিলাম।

অনুরাধা ভিতরে ঢুকে পড়ে আমাকে বলল : উঠে আসুন।

গেট বন্ধ করে আমি গাড়িতে উঠলাম।

পাথুরে পথে অনেকটা এগিয়ে একটা বাড়ির পাশে এসে অনুরাধা থামল। নামবার আগে বার কয়েক হর্ণ বাজাল।

আমরা নেমে পড়ে দেখলাম যে একজন ভদ্রলোক বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। লুঙ্গির মতো কাপড় পরা দক্ষিণী কায়দায়, গায়ে গেঞ্জির উপরে বুশসার্ট। বোতামগুলো লাগাতে লাগাতে বললেন : আসুন।

অনুরাধা ভদ্রলোককে নমস্কার করে বলল : বসব না, আপনার বাগানে কফির চাষ দেখতে এসেছি। আর যদি গোলমরিচ আর এলাচ থাকে তো তাও দেখিয়ে দিন।

আসুন।

বলে ভদ্রলোক আমাদের পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে নিয়ে চললেন। সরু পথ, কিন্তু এমন মসৃণ সে চলতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। ভদ্রলোক বললেন : ফসলতো তোলা হয়ে গেছে। এখন আর কী দেখবেন!

বললাম : কফির গাছ, আর যে ফল থেকে কফি তৈরি হয় তাই দেখবার ইচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন : দুধারেই তো কফির গাছ। দু রকমেরই গাছ আছে—আর্ধিকা আর রোবাস্টা। গ্রোথ দেখেই রোবাস্টা গাছ চিনতে পারবেন।

আমরা যে কফির বাগানের ভিতর দিয়ে চলছিলাম, এ কথা জেনে আমি আশ্চর্য হলাম। মনে হচ্ছিল যে বুনো গাছপালার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম।

এর আগে চায়ের বাগান দেখেছি। সে একেবারে সাজানো বাগান। সেখানে সোজা লাইন ধরে গাছ লাগানো হয় সমান্তরাল ভাবে। সমান ভাবে প্রত্যেকটি গাছ বাড়ে, আর প্রত্যেকটি গাছ একই ভাবে ছাঁটা। মাঝেমাঝে এক একটা লম্বা গাছ মাথা বাড়িয়ে আকাশের দিকে ওঠে—বিরল পাতার গাছ। তা নাকি চায়ের গাছে ছায়া দেবার জন্য লাগানো হয়।

কফির গাছ একেবারে অন্য ধরনের। এ গুল্ম ধরনের গাছ—শ্রাব্‌স্‌। অযত্নে বেড়ে উঠে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি। পাহাড়ের গা যেন আগাছায় ভরে আছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন: এই দেখুন, পাতার আড়ালে কিছু ফল থেকে গেছে।

বলে এক থোকা পাকা ফল সংগ্রহ করে আমার হাতে দিলেন। লালচে রঙের ছোট ছোট ফল। নাকের কাছে এনে কোন গন্ধ পেলাম না। বললাম: এর থেকেই কফি হয়?

ভদ্রলোক বললেন: ফল থেকে নয়, ফলের ভিতর যে ছোট বীজ আছে তারই গুঁড়ো হল কফি।

তারপর বললেন যে এই ফল শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। সেই বীজ রোষ্ট করে গুঁড়িয়ে কফি তৈরি হয়।

—ফ্যাক্টরিতে?

ভদ্রলোক বললেন: না, এর জন্যে বড় ফ্যাক্টরির দরকার হয় না। মার্কারার বাজারেও কফি তৈরির ব্যবস্থা দেখতে পাবেন। ছোট একটি যন্ত্রে রোষ্ট হয়, আর একটি যন্ত্রে গুঁড়ো হয়। অনেক পরিবারে তাজা কফি খাবার রেওয়াজ আছে, তারা নিজেরাই কফি তৈরি করে নেয়।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে কফির চাষ কোন কঠিন কাজ নয়। নিজের বাড়ির বাগানে গোটা কয়েক গাছ লাগালেই সারা বছরের কফি পাওয়া যাবে। বাড়িতেই যদি বীজগুলো ভেজে গুঁড়িয়ে নেওয়া যায় তো বাজারের কফি খাবার দরকারই হবে না।

আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাগানটা দেখবার চেষ্টা করলাম। পাহাড়ের গায়ে বাগান। চারিদিকেই পাহাড়, সমতল ভূমি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে মাঝে মাঝে বড় গাছ দেখা যাচ্ছে এক আধটা। এও বোধহয় ছায়ার জন্যে। সে কথা জিজ্ঞাসা করতেই ভদ্রলোক বললেন: ঠিক বুঝেছেন। এই গাছের নাম পিলী।

অনুরাধা এতক্ষণ নীরব ছিল। এইবারে বলল: আপনার বাগানে গোলমরিচের গাছ নেই?

ভদ্রলোক হেসে বললেন: না।

অনুরাধা আশ্চর্য হয়ে বলল: এই সব গাছেই তো গোলমরিচের লতা দেওয়া হয়।

ভদ্রলোক বললেন: তা হয়। কিন্তু এই বাগানে আমরা লাগাই নি।

ইস্।

বলে অনুরাধা আমাকে বলল: আমি ভেবেছিলাম যে এই বাগানেই আপনাকে আমি গোলমরিচের গাছও দেখাতে পারব। লতার পাশ থেকে বেরোয় ছড়া, সেই ছড়ায় থোকা থোকা গোলমরিচ হয়। কেরালার লোক বলে 'কালো সোনা', তাই না?

ভদ্রলোক বোধ হয় কেরালার লোক। হেসে বললেন: ঠিক তাই।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল: এলাচের গাছ কোথায় আছে বলতে পারেন?

—এই বাগানেই আছে।

—সত্যি!

বলে উজ্জ্বল চোখে অনুরাধা আমার দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন: আসুন আমার সঙ্গে।

বলে আরও নিচে নামতে লাগলেন। তারপরে একটা জায়গায় এসে থামলেন। দেখতে পেলাম যে একটা ঢালু জমিতে হলুদের মতো গাছ আছে অনেক, কিন্তু আকারে অনেক বড়, মানুষ আড়াল হয়ে যাবে তার ভেতরে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: এই সব কি এলাচ গাছ?

—হ্যাঁ।

বলে ভদ্রলোক যেন গৌরবের হাসি হাসলেন।

আমি বললাম : এলাচ তো ফল, ফল কোথায় ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন : এ ফল গাছের মাথায় হয় না, এর ফল হয় শেকড়ে। যে শেকড় মাটির উপরে আছে, তারই গায়ে ফল হয়।

ফল দেখবার জন্যে আমি নিচে নেমে গাছের কাছে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিয়ে বললেন : কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই, ফল এখন দেখতে পাবেন না।

—কেন ?

—ফলের সময় এখন নয়।

এখন বসন্তকাল। বসন্তকালে কি তাহলে কিছুই দেখা যায় না ?

কিন্তু ভদ্রলোক তখন অনুরাধার সঙ্গে কথা বলছিলেন : গত বছর এলাচ একশো টাকারও বেশি দরে বিক্রি করেছি।

এ কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। মনে মনে ভাবলাম যে সেই জন্যেই আমরা গরম মশলা আর রান্নায় দিতে পারছি না। কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল : এবারে দর কেমন ?

ভদ্রলোক বিমর্ষভাবে বললেন : পঁয়ত্রিশের বেশি উঠছে না।

তখন আমার কোড়াভাদের কথা মনে পড়েছে। মনে হল যে এই কফির বাগানেই হয়তো অনুরাধা আমাকে কোডাভাদের দেখাবে। বাগানের মজুর তারা, পুরুষ ও মেয়ে হয়তো একসঙ্গেই কাজ করছে, যেমন চা বাগানে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ দেখা যায়, দেখা যায় পাহাড়ী মেয়ে পুরুষও। কিন্তু এ পর্যন্ত একজন মানুষও দেখতে না পেয়ে আমি বললাম : বাগানে এখন কি কেউ কাজ করছে না ?

ভদ্রলোক বললেন : বাগানে এখন কোন কাজ নেই।

সেকি !

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন : এখন কিছুদিন বাগান এমনি পড়ে থাকবে।

—কোন কাজ হবে না?

—না।

আমি নিরাশ হলাম। কিন্তু অনুরাধা আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল: অমন নিরাশ হচ্ছেন কেন, আসুন আমার সঙ্গে।

বলে সে উপরে উঠতে লাগল।

তাকে অনুসরণ করে আমরাও গাড়ির কাছে ফিরে এলাম।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাল অনুরাধা। আমি তাঁকে নমস্কার করলাম। তার পরে গাড়িতে চেপে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম।

আগের মতোই অনুরাধা বাগানের গেটের কাছে দাঁড়াল, আমি নেমে গিয়ে গেট খুলে দিলাম। তারপরে সে পথের উপরে গিয়ে থামতেই গেট বন্ধ করে আমি তার পাশে উঠে বসলাম।

অনুরাধা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: এইবারে আমরা কোডাভা দেখতে যাচ্ছি। তাদের দেখে ভয় পাবেন না যেন।

—ভয় পাব কেন!

কোডাভারা তো টোর্ডাদের মতো শান্ত শিষ্ট নয়। তাদের কোমরের বেল্টে থাকে ছোরা, আর হাতে বন্দুক। কোন ত্রুটি দেখলে—

—ত্রুটি দেখলে?

—বুঝতেই পারছেন।

—কথায় কথায় ছোরা ছুরি চালায় নাকি?

—দরকার মনে করলেই চালায়।

—আর বন্দুক?

অনুরাধা বলল: অব্যর্থ তাদের লক্ষ্য।

তারপরে সে আমাকে কিয়েল মুহূর্তের গল্প শোনাল। এ একটা পুরুষের খেলা। গাছের আগায় নারকেল বেঁধে বন্দুক দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়। এই খেলা খেলেই তাদের টিপ অব্যর্থ হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোডাভাদের আপনার ভয় করে না?

অনুরাধা সহাস্যে বলল: ভয় করলে কি আর এ দেশে থাকা যায়! এদের হাত থেকে কোথাও নিস্তার নেই।

বলে হাসতে লাগল।

আমি বললাম: আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার এখন ভয় করছে।

—কেন?

—শহর থেকে তো অনেক দূরে চলে এসেছেন। এখানে চেঁচিয়ে কাঁদলেও কেউ শুনতে পাবে না।

—তবে কি ফিরে যেতে বলছেন?

বলে অনুরাধা আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি বললাম: বেলাও তো অনেক হয়েছে! আমাদের হোটেলে বসে দিব্বি খাওয়া যেত।

অনুরাধা বলল: খাওয়ার ভাবনা নেই। কোডাভারা খুবই অতিথি বৎসল।

—কিন্তু ছোরাছুরির কথা যা বলছেন, বেঘোরে প্রাণটা না যায়!

—দেখুন কী হয়!

বলে রাস্তার ধারে একটা গেটের কাছে পৌঁছে প্রবলভাবে অনুরাধা হর্ন দিতে লাগল। একজন ছোকরা ছুটে এসে গেট খুলে দিল। আর অনুরাধা সরবে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পুরনো আমলের সুন্দর এক তলা বাড়ি। সিঁড়ির দুধারে দুটি ছোট ছোট সিংহের মূর্তি, বারান্দায় কারুকার্য করা থাম, দরজার চৌকাঠও কারুকার্য করা। উপরে টালির ছাদ।

গাড়ি থেকে নেমে অনুরাধা বলল: আসুন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: এ কোথায় এলাম!

কিন্তু অনুরাধা এ কথার উত্তর দেবার অবকাশ পেল না। তার আগেই এক সুন্দরী মহিলা হাতে একটি ছোট ঘড়া নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। শাড়ি পড়েছেন অদ্ভুত

কায়দায়—বুকের উপর দিয়ে দু হাতের নিচে দিয়ে গেছে শাড়ির পাড়, জামার মতো বাঁধা আছে কোনখানে। আমাকে এখন কী করতে হবে বুঝতে না পেরে আমি অনুরাধার দিকে তাকালাম।

অনুরাধা ফিস ফিস করে বলল: জলের ঘড়াটি হাতে নিন। তারপরে হাত পা ধুয়ে নিন ঐ জলে।

ভয়ে ভয়ে আমি জলের ঘড়াটি হাতে নিলাম। আর তারপরেই দেখতে পেলাম এক সুপুরুষ ভদ্রলোককে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, নাকের নিচে চওড়া গোঁফ। পোষাকটিও অদ্ভুত। চুড়িদার সাদা পায়জামার উপরে সাদা সার্ট। তার উপরে কালো আলখাল্লার মতো হাত কাটা জামা। মাথায় পাগড়ি, তার উপরে ফিতে জড়ানো ক্রস চিহ্নের আকারে। ভাল করে নজর দিতেই দেখলাম যে কোমরে বেল্টের সঙ্গে ছোরা, আর হাতে বন্দুক। ভদ্রলোক আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

কেন জানিনা, এদের দেখে আমার কোন ভয় হল না। তবু আমি ফিসফিস করে অনুরাধাকে জিজ্ঞাসা করলাম: কোডাভা নাকি?

ইংরেজীতেই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল, এ প্রশ্নটাও করেছিলাম ইংরেজীতে। কিন্তু সহাস্যে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, বললেন: হ্যাঁ, জাতে আমরা কোডাভা।

তারপরে অনুরাধাকে বললেন: অনুরাধা, ঘড়াটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে নাও। অকারণে ওঁর জুতো মোজা খুলিও না।

অনুরাধা সহাস্যে ঘড়াটা আমার হাত থেকে নিয়ে ভেতরে রেখে এল।

ভদ্রলোক বললেন: অতিথি এলে প্রথমেই আমরা হাত পা ধোবার জন্যে জল দিয়ে থাকি। মেয়েরাই ঘড়ায় করে এই জল দেয়।

তারপরে তিনি আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। একেবারে আধুনিক ভাবে সাজানো ড্রয়িং রুম। আমি চারি দিকে চেয়ে

দেখছিলাম। আর আমাকে দেখেই অনুরাধা হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

এই হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি হাসছেন কেন?

হাসতে হাসতেই অনুরাধা বলল : কোডাভা দেখলেন! আমার দাদা আর বৌদি।

ভদ্রলোক আমাকে একখানা সোফায় বসিয়ে দিয়ে বললেন : খুব ঠকিয়েছে আপনাকে। কুর্গের প্রায় সব অধিবাসীই কোডাভা। জেনারেল কারিয়াপ্পা, জেনারেল থিমায়ার নাম শুনেছেন তো? ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁরাও কুর্গের কোডাভা।

অনুরাধা তার বৌদিকে বলল : আমাদের সঙ্গে খেতেও ওঁর ভয় আছে, তাই আমাকে হোটেলে খেতে বলছিলেন।

অনুরাধার বৌদি বললেন : তুমি যা দুষ্টু, তোমাকেই ওঁর ভয়।

অনুরাধা আমার দিকে চেয়ে আর একবার হাসল।

আহারের পর অনুরাধার দাদা বললেন: আজই কি আপনি ফিরে যাবেন?

বললাম: সেই রকমই ইচ্ছা।

অনুরাধা বলল: কাল সকালেও যেতে পারেন।

বললাম: আর কিছু তাহলে দেখা হবে না।

অনুরাধার দাদা বললেন: সে ভাল নয়। গল্প করে সময় কাটানোর চেয়ে কিছু দেখে শুনে ফেরাই ভাল। চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আপনি কষ্ট করবেন!

ভদ্রলোক হেসে বললেন: তাহলে অনুরাধাই যাক!

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম: না না, আমি সে কথা বলছি না।

—তবে আপনাকে পথের ধারেই বসে থাকতে হবে।

—কেন?

—বাস কখন্ যাবে, সে কথা আমাদের জানা নেই।

বলে তিনি উঠে পড়লেন।

অনুরাধা জিজ্ঞাসা করল: আপনি কি মাইসোর যাবেন, না ব্যাঙ্গালোর?

বললাম: হাতে যখন একটা দিন পাচ্ছি, তখন মাইসোরটাও দেখে যাওয়া উচিত, তাই না?

অনুরাধা বলল: খুবই ঠিক কথা। ব্যাঙ্গালোরে দেখবার কিছু নেই, অবশ্য—

বলে অনুরাধা থেমে গেল।

আমি বললাম: বলুন।

—হাসানের পথে ব্যাঙ্গালোর গেলে বেলুর আর হালেবিডের মন্দির আপনি দেখতে পেতেন। এ সব মন্দির দেখতে তো আপনার ভালই লাগে বলছিলেন।

বললাম : দেখবার মতো মন্দির শুনেছি।

—সত্যিই দেখবার মতো। কিন্তু ঝামেলা আছে কিছু।

—কী রকম?

অনুরাধা বলল : হাসানে নেমে সকালে আপনাকে একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। মানে, আজকের রাতটা আপনাকে হাসানের টুরিষ্ট বাঙলোয় কাটাতে হবে।

অনুরাধার দাদা তাঁর পোষাক বদলে ফিরে এলেন। কোডাভার পোষাক ছেড়ে আমাদের মতো বেশ পরেছেন। বললেন : কী পরামর্শ হচ্ছে?

অনুরাধা বলল : বেলুর আর হালেবিডের মন্দির দেখতে চান, আবার মাইসোরও দেখবার ইচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন : বেশ তো, আজ মাইসোর পৌঁছে কাল ভোরে একটা টুরিষ্ট বাস ধরে ও সব দেখে নেবেন। টুরিষ্ট বাসে গেলে শ্রবণ বেলগোলার বিরাট গোমতেশ্বর মূর্তিও দেখা হয়ে যাবে।

অনুরাধা বলল : তাহলে ওঁর মাইসোর দেখা তো হবে না! ওঁকে বোধহয় রাতের গাড়িতেই ফিরতে হবে। তাই না?

—খুব ঠিক।

অনুরাধার দাদা বললেন : তবে এক কাজ করুন। সোজা মাইসোরেই চলে যান। হয়শাল রাজারা তিনটে মন্দির গড়েছিলেন—বেলুরে, হালেবিডে, আর একটা সোমনাথপুরে। সোমনাথপুর মাইসোরের বেশ কাছে বলে শুনেছি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে দেখে আসতে পারবেন। মাইসোরও দেখা হবে।

আমি বললাম : খুব ভাল আইডিয়া।

ভদ্রলোক বসলেন না দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সৌজন্য প্রকাশের জন্যে বললাম : আপনাদের আমি শুধু কষ্টই দিলাম।

আনন্দও দিয়েছেন।

বলে ভদ্রলোক দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আমি অনুরাধার বৌদিকে নমস্কার করলাম, অনুরাধাকে ধন্যবাদ দিলাম অনেক। বললাম: আপনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে এখানকার কিছুই আমার দেখা হত না।

অনুরাধার দাদা আমাকে মার্কারার বাসস্ট্যাণ্ডে নামিয়ে দিলেন। গাড়ি থেকে নেমে আমি বললাম: আপনাকে কষ্ট দিলাম বলে খারাপ লাগছে।

উত্তরে ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন: আপনার জন্যেই এখানে এসেছি ভাবছেন কেন!

তারপরেই বললেন: আমার নিজেরও কাজ আছে।

বলে হাত নেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন।

মনে হল, এ তাঁর ভদ্রতার কথা। আমাকে পৌঁছে দিতেই তিনি এখানে এসেছিলেন। সে কথা স্বীকার না করে আমাকে একটা অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে গেলেন।

বাসের খবর নিয়ে আমি হোটেলে ফিরলাম। যে বাসখানা কিছুক্ষণের মধ্যে ছাড়বে, তাতে চাপলে সন্ধ্যার আগেই মাইসোরে পৌঁছতে পারব। তাই আমি হোটেলের পাওনা মিটিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে বাসষ্ট্যাণ্ডেই ফিরে এলাম। হোটেলের ম্যানেজার বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। আমি যে একটা রাতও থাকব না, তা ভাবতে পারেন নি। বললেন: শুধু শুধু খাতায় নাম লিখে ঘরের ভাড়া দিলেন।

মার্কারা থেকে মাইসোরে সারা দিন বাস যাতায়াত করে। পঁচাত্তর মাইল পথ ঘণ্টা তিনেকেই পৌঁছনো যায়। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পরে সমতল ভূমি অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগে না।

মনে মনে আমি হিসেব করে দেখলাম যে রাতের ট্রেনে আমার ফেরবার দরকার নেই। পুরো একটি দিন হাতে আছে। কাল রাতে মাইসোর থেকে ট্রেন ধরলেই চলবে। একদিন আগে ম্যাড্র্যাসে পৌঁছবার কোন মানে হয় না। সেখান থেকে ফেরার রিজার্ভেসন তো আমার আছে, কোন দুর্ভাবনার কারণ নেই।

মাইসোরে পৌঁছে আমি তাই আর কোন দ্বিধা করলাম না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলাম হোটেলে। বাসুদেবন দম্পতির সঙ্গে এইখানেই আমার পরিচয় হল। এ আমার আর এক ধরনের অভিজ্ঞতা।

হোটেলের বারান্দায় বসে ভদ্রলোক পাইপ টানছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী একটি প্রজাপতির মতো রঙীন শাড়ি পরে তাঁর পাশে বসে ছিলেন। বোধহয় তাঁদের পাশের ঘরখানিই আমার ভাগ্যে জুটল। আর ঘরে ঢোকবার সময় একটি মন্তব্য শুনতে পেলাম: বাঙালী মনে হচ্ছে।

মন্তব্যটি করেছিলেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু বাঙলায় নয়। কোন দক্ষিণ-দেশী ভাষায়, কিন্তু বাঙালী শব্দটি বুঝতে পেরেছিলাম। আর ভদ্রলোক বোধহয় নিঃশব্দে কোন সঙ্কেত করেছিলেন। তাই তাঁর কোন উত্তর আমি শুনতে পাই নি। কিংবা কোন উত্তর দেবার আগেই আমি নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম।

সেই ভোরবেলা থেকে অনেক পথ আমার অতিক্রম করা হয়েছে। ম্যাঙ্গালোর থেকে মার্কারা, মার্কারা থেকে মাইসোর। মার্কারাতেও গাড়িতে করে অনেক ঘুরেছি। এখন তাই ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। রাতের

ট্রেনে ফিরতে হলেও আর উৎসাহ পেতাম না। ভাবলাম সন্ধ্যে বেলাটা আজ বিশ্রাম করেই কাটাব। জিনিষপত্র ঘরে সাজিয়ে রেখে বেয়ারাকে একপট চা বারান্দার টেবিলে দিতে বললাম।

হোটেলের লম্বা বারান্দাটি বেশ ভাল। প্রতি ঘরের সামনে একখানি চৌকো টেবিল আর খান দুই চেয়ার রাখা আছে। বাথরুমে মুখ হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

সেই দম্পতি তখনও বাইরেই বসে ছিলেন। যদি তাঁরা সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি উত্তর দিতে পারতাম। গল্প করতে চাইলে গল্প করার জন্যেও তাঁদের কাছে গিয়ে বসতে পারতাম, কিন্তু চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করলে তার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কতকটা ভদ্রতার খাতিরেই বসবার আগে তাঁদের দিকে চেয়ে নমস্কার করলাম। তার মানে, পরিচয় জানবার ইচ্ছা থাকলে প্রশ্ন করুন।

ইঙ্গিতটা কাজে লাগল। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন: অনেক দূর থেকে আসছেন?

বাঙলায় নয়, ইংরেজীতে কথা। বললাম: বেশি দূর নয়, মার্কারা থেকে।

—মার্কারা!

বললাম: হ্যাঁ, দুপুরের বাসে এসেছি বলেই বোধহয় বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ভদ্রমহিলা এবারে প্রশ্ন করলেন: মার্কারা কোথায়?

ভদ্রলোকও আমার মুখের দিকে তাকালেন। তিনিও যে মার্কারার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তা বুঝতে পেরে বললাম: বৃটিশ আমলে কুর্গ নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এখন তা মাইসোর রাজ্যের একটি জেলা। মার্কারা কুর্গের প্রধান শহর।

—সেখানে কেন গিয়েছিলেন?

বলে ভদ্রমহিলা আমাকে যেন আক্রমণ করলেন। মনে হল,

এখানে এত সুন্দর জায়গা থাকতে মার্কারায় কেন সময় নষ্ট করতে গেলাম, তারই কৈফিয়ৎ তিনি চাইছেন। তাই উত্তরে বললাম : মার্কারায় যাব বলে যাই নি।

—তবে ?

—ম্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম কাজে, মার্কারার উপর দিয়ে ফিরছি। এখান থেকে ট্রেন ধরে দেশে ফিরব।

ভদ্রলোক যেন আরও আশ্চর্য হলেন, বললেন : এখানে কিছু দেখবেন না ?

সংক্ষেপে বললাম : সময় নেই।

ভদ্রমহিলা যেন আর্তনাদ করে উঠলেন : এমন সুন্দর শহরটা আপনি না দেখেই ফিরে যাবেন !

ভদ্রলোক বললেন : শুধু শহর বলছ কেন, রাজ্য বল। ভারতবর্ষে কি এমন সুন্দর রাজ্য আর একটা আছে !

নানা কারণে আমার বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। এই দম্পতির দিকে মুখ করে বসতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। ভদ্রমহিলা ছিলেন আমার খুব কাছে। তাকালেই আমি তাঁর পাতলা শাড়ির নিচে ছোট ব্লাউজটি দেখতে পাচ্ছিলাম। দেহের অনেকখানিই খোলা, আর বাতাসে শাড়ির আঁচলও মাঝে মাঝে খসে পড়ছিল। মুখের ও ঠোঁটের রঙ এবং সেন্টের উগ্র গন্ধও মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। ভদ্রলোক দূরে ছিলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে এড়িয়ে তাঁর দিকে তাকানো সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিচের রাজপথের দিকে চেয়ে বললাম : উপায় থাকলে এমন তাড়াহুড়ো করে ফিরে যেতাম না।

ভদ্রমহিলা এবারে তাঁর চেয়ারখানা এমনভাবে ঘুরিয়ে নিলেন যে আমার আরও লজ্জাবোধ হল। শাড়ির আঁচল একেবারেই খসে পড়েছিল। সেটা গায়ের উপরে তুলে দিয়ে বললেন : ভাবছেন, আমাদের হাতে বুঝি প্রচুর সময় ছিল !

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি নীরবেই রইলাম।

মহিলা বললেন : উনিও তো সরকারী কাজে এসেছিলেন। আমি বললাম, ফিরব না। আমাকে ফেলে কী করে ফিরে যান দেখি!

আমি হেসে বললাম : আমার চাকরি তাহলে যাবে!

—উঁহু। সরকারী চাকরি অত সহজে যায় না। আর সবাই যা করছে, তার জন্যে চাকরি যাবে কার!

ভদ্রলোক ওধার থেকে বললেন : আমার বিপদটা তাহলে বুঝুন।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কি একা এসেছেন?

বললাম : হ্যাঁ।

—কেন?

বলে ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকালেন।

কোন কঠিন কথা আমি বলতে পারলাম না। যতটা সম্ভব মোলায়েম ভাবে বললাম : যখন কাজে বেরোই, তখন আমি একাই বেরোই।

ভদ্রলোক বললেন : খুব ভালই করেন—

কিন্তু স্ত্রীর ধমক খেয়েই থমকে থেমে গেলেন। তিনি বললেন : তুমি থামো তো। সরকারী কাজের কোন সুবিধা নিতে শিখলে না। বললাম, একখানা গাড়ি জোগাড় করে শহরটা ভাল করে দেখে নিই। তা নয়, এক টুরিস্ট বাসে তুলে প্রায়শ্চিত্ত করালে।

কথাটা তিনি নিজেদের ভাষাতেই বলতে পারতেন, কিন্তু তা না বলে ইংরেজীতেই বললেন। ভদ্রলোকও বেশ অপ্রতিভ ভাবে বললেন : প্রায়শ্চিত্ত বলছ কেন! খুব যত্ন করেই তো তারা সব কিছু দেখাল। খাবার সময় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে হোটেল থেকেই আবার তুলে নিয়ে গেল।

—উঃ কী কষ্ট!

বলে ভদ্রমহিলা তাঁর রুমাল দিয়ে নাকের দুপাশ মুছতে লাগলেন।

হোটেলের বেয়ারা এই সময়ে আমার চা এনে একটা ছোট টেবিলের উপরে রাখল। আমি তাঁদের মুখের দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক বললেন: থ্যাঙ্ক্স্, আমরা একটু আগেই খেয়েছি।

চা ঢালবার সময় আমার মনে হয়েছিল যে আমাদের আলাপ বোধহয় এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম যে তা হল না। ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইংরেজীতেই কথা বলতে লাগলেন: কষ্টের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। এক বাস মানুষ একসঙ্গে বসলে যে কী রকম গরম হয়, তার কোন বোধই তোমার নেই। আর তাছাড়া মহিলাদের সম্মান রাখতে এ দেশের লোক জানে না। মেয়েদের যে আগে নামতে দেবে, এ ভদ্রতাটুকুও কারও জানা নেই।

ভদ্রলোক বোধহয় জানতেন যে উত্তর দিলেই বিপদ বাড়বে, তাই গভীর মনোযোগে পাইপ টানতে লাগলেন। আর আমি মুখ ফিরিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

কিন্তু ভদ্রমহিলা থামলেন না, বললেন: তুমি যদি ভেবে থাকো যে কাল আমি এমনি করেই বাসে চেপে দুশো মাইল ঘুরতে বেরোব তাহলে খুব ভুল করবে।

—দুশো মাইল নয়।

—কে বলল দুশো মাইল নয়?

ভদ্রলোক অত্যন্ত মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করলেন: না না, অত হবে না।

—হবে না মানে! কাল কত মাইল ঘুরেছি বল!

ভদ্রলোক কোন্ উত্তর দিলেন না।

ভদ্রমহিলা বললেন: আমি বলে যাচ্ছি, তুমি হিসেব কর। সকাল সাড়ে আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টায় কত মাইল ঘুরেছি?

—থেমেছিও অনেক জায়গায়, অনেক কিছু দেখেছি।

— ছাই দেখেছি।

আমার দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন: জগমোহন প্যালেস, সিল্ক ফ্যাক্টরি, জু, ললিতামহল প্যালেস, চামুণ্ডি পাহাড়ে চামুণ্ডি দেবীর মন্দির, আর সেই বিরাট নন্দী। নেমে নেমে এ সব দেখতেই তো সময় লেগেছে!

ভদ্রমহিলা বললেন: তারপর? দুপুর তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কী করলে? টা-টা করছে দুপুর রোদ, কোথায় একটু আরাম করবে তা নয়। দশ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গপত্তনে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিলে বাস থেকে। বললে, হেঁটে হেঁটে সব দেখতে হবে।

ভদ্রলোক প্রতিবাদ করে বললেন: বাসই তো সব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল!

— নিয়ে গিয়েছিল মানে? গেটের বাইরে নামিয়ে দিয়ে বলল, এই হল দরিয়া দৌলত, হেঁটে গিয়ে দেখে এসো। কতটা দূর বল, আধ মাইল হবে না?

—পাগল নাকি!

—তা বলবে বৈ কি!

ভদ্রলোক বললেন: বলেছিলাম তো, তোমার গিয়ে কাজ নেই, তুমি গাড়িতেই বসে থাক। টিপু সুলতানের সামার প্যালেস দেখে এসে আমি তোমায় গল্প বলব।

ভদ্রমহিলা বললেন: আমাকে তাহলে নিয়ে গিয়েছিলে কেন?

বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: এ সব কি এক জায়গায়! একবার সামার প্যালেস দেখতে নামুন, তারপর দেখুন টিপু সুলতানের ডানজান। মানে, মাটির নিচে জেলখানা। না জানি কী ব্যাপার, বলে নিচে নামুন অন্ধকারের মধ্যে। কোন রকমে উঠে এসে দেখুন, বাস নেই, বাস চলে গেছে টিপু সুলতানের দুর্গের সামনে। তারপরে সেই দুর্গে ঢুকে রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির দেখতে হবে। কাজেই মাঠের

ভেতর দিয়ে হেঁটে দুর্গের দরজায় গিয়ে পৌঁছোন। অবস্থাটা বুঝুন একবার!

বলে তিনি আবার আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললাম: কষ্ট আছে বৈ কি!

ভদ্রমহিলা চটে উঠলেন, বললেন: সত্যি কি আর কষ্ট আছে! এ কষ্ট নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে। বাসে না উঠে একটা গাড়ির ব্যবস্থা কি করা যেত না! সরকারী কাজে এসেছ, সরকারী কাজ করলে, আর একটা সরকারী গাড়ীর ব্যবস্থা করে একটু ঘোরা ফেরা করা যেত না! অনেক সরকারী লোকের তো নিজের গাড়িও আছে, কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারলে না!

আমার বলবার ইচ্ছা হয়েছিল যে মাইসোর সহরে ট্যাক্সিরও কোন অভাব নেই। কিন্তু এ কথা বললাম না। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর কলহে আমার যোগ না দেওয়াই উচিত।

ভদ্রলোক বললেন: সরকারী গাড়িতে আর কত ঘোরা যায় বল! বাজার হাটে তো কম ঘোর নি!

ভদ্রমহিলা বললেন: তখন কি জানতাম যে বাজার হাটে ঘুরলে শ্রীরঙ্গপত্তনে তুমি বাসে নিয়ে যাবে!

—বোঝা উচিত ছিল।

—না। বাসে চেপে কেউ শহর দেখে না।

ভদ্রলোক বোধ হয় তর্ক এড়াবার জন্যেই পাইপ মুখে দিলেন, স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দিলেন না।

ভদ্রমহিলা তাই আমাকে বললেন: অনেক কষ্টে রঙ্গনাথের মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে শুনলাম যে শ্রীরঙ্গপত্তনেই আরও দু জায়গায় নামতে হবে। গুম্বজ নামে টিপু সুলতানের সমাধি আছে, আর কাবেরী সঙ্গম। বাস থেকে নামা ওঠায় যে কী কষ্ট, আপনি তা বুঝবেন। ভিড়, ধাক্কাধাক্কি, কেউ কারও পথ ছেড়ে দেবে না, সবাই নামবে এক সঙ্গে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু ভদ্রমহিলা থামলেন না, বললেন : নামলাম না আমি। আর ইনিও আমাকে নামতে বললেন না। ফেরার আগে ডাবের গরম জল খাওয়ালেন খানিকটা। আর বললেন, কাবেরী সঙ্গমে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীর নাকি জুড়িয়ে গিয়েছিল !

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ নদীর সঙ্গে সঙ্গম ?

বলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন : জানি নে।

ভদ্রমহিলা বললেন : ওঁর আক্কেলটা একবার দেখুন। ভাল জায়গা, তো ডেকে নিয়ে যেতে হয়! কোন্‌টা ভাল জায়গা আর কোন্‌টা মন্দ, বাসে বসে আমি তা জানব কেমন করে! এটুকু বুদ্ধিও ওঁর নেই!

মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে ভদ্রলোক বললেন : কোন্ জায়গা ভাল আর কোন্ জায়গা মন্দ, নিজে দেখেই তার বিচার করতে হয়।

এই পরিবেশ আমার ভাল লাগছিল না। চা শেষ করেই আমি উঠে পড়ব ভাবছিলাম। তাড়াতাড়ি কয়েকটা চুমুক দিলাম।

ভদ্রমহিলা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : কোথাও বেরোবেন নাকি ?

বললাম : হোটেলে বসে থেকে করব কী! একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবেন ? বৃন্দাবন গার্ডেনে ?

বললাম : অত দূরে যাবার সময় নেই।

—কিন্তু জায়গাটা মন্দ নয়, ভাল লাগবে সন্ধ্যেবেলায়।

তারপরেই বললেন : নদীর বাঁধে কি না, আর বাগানটিও সুন্দর। তবে আজ বোধ হয় আলো জ্বলবে না। ফোয়ারার ভেতর আলো জ্বললে আরও সুন্দর দেখায়।

ভদ্রলোক একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : যাক, একটা জায়গা তাহলে ভাল লেগেছে।

এই সময়ে ভদ্রমহিলার বোধহয় পুরানো প্রসঙ্গের কথা মনে পড়ে গেল। বললেন: তাই বলে ভেবো না যে আমি বাসে চেপে শ্রবণ বেলগোলা বেলুর ও হালেবিড ঘুরতে যাব! বাসওয়ালা যতই তোমাকে বোঝাক, আমি তার বাসে উঠছি না।

তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: এ সব জায়গা কত দূরে জানেন?

বললাম: না।

—নাম শোনেন নি?

বলে বেশ করুণার চোখে আমার দিকে চাইলেন বলে ভাল লাগল। তাঁকে খুশী করবার জন্যেই বললাম: না।

—কী আশ্চর্য!

বলে তিনি আমাকে এইসব জায়গার কথা সাগ্রহে বোঝাতে লাগলেন। বললেন: মাইসোরে এসে এ সব জায়গা না দেখে ফিরলে পরে আপনাকে পস্তাতে হবে। আসল মাইসোর তো শহরে নয়, শহরের বাইরে। প্রথমে শ্রবণ বেলগোলায় যাবেন। এখান থেকে কত মাইল দূরে বলল?

ভদ্রলোক বললেন: ষাট মাইল।

—সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বেন। ছোট একটা পাহাড়ের উপরে উঠলে বিরাট একটা জৈন মূর্তি দেখতে পাবেন। কত উঁচু বলতো?

—সাতান্ন ফুট।

—বুঝুন তাহলে। এত বড় মূর্তি বোধ হয় আর কোথাও নেই। তারপর চলে যাবেন বেলুর আর হালেবিডে। এ দুটি মন্দির দেখলে জীবনে আর ভুলবেন না। এখান থেকে কত মাইল দূরে বলতো?

ভদ্রলোক যেন এই সব মাইলের হিসেব মুখস্থ করে রেখেছেন। কিন্তু তিনি এইবারে আটকে গেলেন, বললেন: মনে নেই।

—সে কি, এই না এত জিজ্ঞাসাবাদ করলে! এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে!

—তুমিও তো শুনেছিলে!

—মনে রাখবার দায়িত্ব আমার নয়!

বলে ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন: যান না, কাল এই সব দেখে আসুন!

বললাম: সময় থাকলে নিশ্চয়ই দেখতাম।

—এই আপনাদের দোষ! মাইসোরে এসে কিছু না দেখেই আপনারা ফিরে যান। দিল্লীতে ফিরে কী বলবেন?

বললাম: দিল্লী নয়, আমি পাটনায় ফিরব।

কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার উত্তর গ্রাহ্য না করেই বললেন: তাহলে এক কাজ করুন।

বলুন।

বলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন: মাইসোরের কাছেই একটা সুন্দর মন্দির আছে। কী নাম জায়গাটার বলতো?

—সোমনাথপুর।

—ঐ সোমনাথপুরের মন্দির দেখে আসুন। বেশি দূর তো নয়! কত মাইল দূরে বল তো?

—কুড়ি-বাইশ মাইল।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলেন: যাবেন?

বললাম: আমাকে তো কাল রাতের ট্রেন ধরতে হবে। দিনের বেলায় কাছেপিঠে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারব।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন: তাহলে আসুন না, সস্তায় একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায় কিনা দেখি।

বলে উঠে পড়লেন।

আমার চা-ও শেষ হয়েছিল। আমিও উঠে পড়লাম।

কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার কাছে ঘেঁষে এসে বললেন: এখানে আপনার সরকারী কাজ নেই?

বললাম: না।

—কোন বন্ধুবান্ধব নেই?

—তাও নেই।

—কী আশ্চর্য! বিদেশে আপনারা একেবারেই অসহায় দেখছি। বলে গটগট করে এগিয়ে গেলেন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা ফুটপাথ ধরেই এগিয়ে চললাম। ইতিমধ্যে এঁদের নাম আমি জেনে ফেলেছি। মিস্টার ও মিসেস বাসুদেবন। মিস্টার বাসুদেবন যে দিল্লীতে সরকারের পদস্থ কর্মচারী তা আগেই জেনেছিলাম। সরকারী কাজ শেষ হবার পরে যে তাঁরা এখন মাইসোর দেখে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাও এঁদের কাছেই শুনেছি। মিস্টার বাসুদেবন বললেন: ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড বেশি দূরে নয়। এ পথটা হাঁটতেই ভাল লাগবে।

আমি বললাম: গাড়িতে আজ অনেক চড়েছি, হাঁটতে আমারও ভাল লাগবে।

কিন্তু ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাঁর বোধহয় হাঁটার অভ্যাস নেই। একটু বিরক্তভাবেই হাঁটছেন। মনে হল, সকালবেলায় হয়তো অনেক ঘুরেছেন, এ বেলায় তাই হাঁটতে চাইছেন না।

আমার কথার পর কোন কথা বললেন না দেখে বললাম: আপনারা বোধহয় সকালে অনেক ঘোরাঘুরি করেছেন?

মিসেস বাসুদেবন এইবারে তাঁর উষ্মা প্রকাশ করলেন, বললেন: াই ঘুরেছি।

আমি আর কিছু বলার সাহস পেলাম না।

কিন্তু মিস্টার বাসুদেবন বললেনঃ কী করব বল, চেষ্টার তো ত্রুটি করি নি।

তারপর একটু দুঃখিত ভাবে বললেনঃ আমি যদি পার্চেজ ডিপার্টমেন্টের অফিসার হতাম, তাহলে দশখানা গাড়ি দশ দিকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের টানা হেঁচড়া করত। কিন্তু সে সৌভাগ্য নিয়ে তো জন্মাই নি। এক একজনের এক এক বায়নাক্কা। আসলে দুশো মাইল ঘোরাবার জন্যে গাড়ি কেউ দেবে না।

মিসেস বাসুদেবন বললেনঃ যাদের যোগ্যতা আছে, তারা ঠিকই আদায় করে।

কিন্তু মিস্টার বাসুদেবন এ কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে বললেনঃ সাত পাঁচ ভেবে একবার ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডেও গিয়েছিলাম। ওদের দাবী শুনে তো চক্ষু স্থির।

—কী রকম ?

—দুশো টাকা। ভোর বেলায় নিয়ে যাবে, আর ফিরিয়ে আনবে সন্ধ্যা বেলায়। শ্রীরঙ্গপত্তনের উপর দিয়ে শ্রবণবেলগোলা যাবে, তারপর বেলুর হালেবিড দেখিয়ে ফিরিয়ে আনবে।

মুখ বেঁকিয়ে মিসেস বাসুদেবন বললেনঃ টাকার শ্রাদ্ধ আর কি!

আমি বললামঃ দরাদরি বোধহয় করতে হত!

মিসেস বাসুদেবন বলে উঠলেনঃ কত ?

—তা ঠিক।

বলে আমি চুপ করে গেলাম।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে মিস্টার বাসুদেবন বললেনঃ আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি সোমনাথপুরের ভাড়া জেনে আসি।

মিসেস বাসুদেবন বললেনঃ তুমি পারবে না, আমি যাচ্ছি।

মিস্টার বাসুদেবন বলে উঠলেনঃ তুমি আমার সঙ্গে এসো না, তোমাকে দেখলেই ডবল ভাড়া চাইবে।

বলে মিস্টার বাসুদেবন এক দিকে হনহন করে এগিয়ে গেলেন।

আর মিসেস বাসুদেবন আমাকে বললেন: আপনি আসুন তো আমার সঙ্গে।

বলে রাস্তা ডিঙিয়ে একটা অন্ধকার জায়গার দিকে এগোলেন।

সেদিকেও অনেকগুলি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। জনকয়েক ড্রাইভার এগিয়ে আসতেই মিসেস বাসুদেবন আমাকে বললেন: জিজ্ঞেস করুন তো সোমনাথপুর ঘুরিয়ে আনতে কত নেবে।

আমি প্রশ্ন করলাম। নানা রকমের ভনিতা করবার পর একজন জানাল যে পঁচিশ টাকার কমে বাইশ মাইল পথ যাতায়াত সম্ভব নয়।

—পঁচিশ টাকা!

বলে মিসেস বাসুদেবন পিছিয়ে এলেন।

ফেরার পথে আমি বললাম: এর কম আর কী নেবে!

ভদ্রমহিলা বললেন: পাগল হয়েছেন আপনি! দু ঘণ্টার জন্যে পঁচিশ টাকা খরচ করব!

দুতিন জন ড্রাইভার পিছনে আসছিল। জিজ্ঞাসা করল, কখন বেরোব, কোথায় গাড়ি নিয়ে আসবে, ইত্যাদি।

—গাড়ি চাই নে।

বলে আমরা ফিরে এলাম।

মিস্টার বাসুদেবনও ফিরে এসেছিলেন। বললেন: ডাকাত এরা।

মিসেস বাসুদেবন বললেন: আমি তো সঙ্গে ছিলাম না. কত নেবে বলল?

মিস্টার বাসুদেবন বললেন: চল্লিশ টাকা।

সগৌরবে মিসেস বাসুদেবন আমার দিকে চেয়ে বললেন: দেখলেন তো!

মিস্টার বাসুদেবন তাকালেন আমার দিকে।

আমি বললাম : আমাদের কাছে পঁচিশ টাকা চেয়েছে।

—তবে তো ভালই হয়েছে। আমরা আধাআধি দেব।

আমি বললাম : তাহলে কখন হোটেলে আসতে বলব? সকাল সাতটায়?

মিসেস বাসুদেবন বললেন : ভোরবেলায় উঠতে হলে রাতে আমার ঘুম হবে না।

বললাম : তাহলে সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই ঠিক করা যাবে।

মিস্টার বাসুদেবন জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় যাবেন এখন?

এঁদের সঙ্গ আমার ভাল লাগছিল না। তাই বললাম : পথে পথে একটু ঘুরব।

তখন আমরা আলোয় উজ্জ্বল রাজপথের উপরে পৌঁছে গেছি। বড় বড় দোকান পাট লোকজনে জমজমাট এই জায়গা। বললাম : আসি এবারে!

ভদ্রলোক বললেন : হোটেলেই তাহলে দেখা হবে।

—হ্যাঁ।

বলেই আমি এগিয়ে গেলাম। আর পিছনে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর আবার শুনলাম : শাড়ি দেখবে বলছিলে!

ভদ্রমহিলার উত্তরও আমি শুনতে পেলাম : দেখব নয়, কিনব। সেইজন্যেই তোমার ট্যাক্সির খরচ বাঁচাচ্ছি।

বাজার হাটের শখ আমার নেই, আমার শখ হল দেখবার। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘন হয়েছে বলে তারও সুবিধে নেই। দেখবার যা কিছু, তা আমাকে কালই দেখতে হবে। তাই আর অকারণে না ঘুরে একখানা অটো রিক্সা ধরে হোটেলেই ফিরে এলাম।

রাতের আহারের সময় হয় নি বলে আমি বারান্দাতেই বসলাম। চা আজ দেরিতে খেয়েছি, সেজন্য খাওয়ারও তাগিদ নেই। বারান্দাটি

ভাল লাগছে। ঝির ঝির করে বসন্তের বাতাস আসছে। এই বাতাসেই ক্লান্তি দূর হচ্ছে।

বাসুদেবন দম্পতি ফিরলেন বেশ একটু দেরিতে। মনে হল হেঁটেই ফিরলেন। কেননা নিচে কোন যানবাহনের শব্দ পেলাম না। আর বেশ ক্লান্ত হয়ে ফিরলেন ভদ্রমহিলা। হাঁপাচ্ছিলেন। ঘরের সামনে এসে চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লেন, আর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে কপালের ও মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। গায়ের জামাও ভিজে গিয়েছিল। মিস্টার বাসুদেবন বোধ হয় কোন কঠিন কথা বলতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার কোন কথা বলা উচিত হবে না ভেবে আমি অন্য ধারে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

এঁদের হাতে কিছুই ছিল না। বুঝতে পারলাম যে কেনাকাটা কিছুই করেন নি। মিস্টার বাসুদেবন গম্ভীরভাবে দরজার তালা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন। কিন্তু আর বেরিয়ে এলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভদ্রমহিলাও ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপরে কলহের শব্দ শুনতে পেলাম। এখন আর ইংরেজীতে নয়, নিজেদের ভাষায়। কলহের জন্যে এ ভাষা যে পরম উপযোগী, তা আমি বাইরে বসেই বিশ্বাস করলাম।

কেন জানি না, আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ক্ষুধারও উদ্রেক হল। আর দেরি না করে আমি ডাইনিং হলের দিকে এগিয়ে গেলাম রাতের আহারের জন্য।

পরদিন সকালে উঠতে বোধ হয় একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম যে বাসুদেবন দম্পতির ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। প্রথমটায় বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরে মনে হল যে বোধ হয় প্রাতরাশের জন্য ডাইনিং হলে গেছেন। কিন্তু নিজে খেতে গিয়ে দেখলাম যে তাঁরা সেখানে নেই। ভোর বেলাতেই যে কোথাও বেরিয়ে গেছেন, তাতে আর সন্দেহ রইল না।

চা খেতে খেতে আমার মনে হল যে তাঁরা বোধহয় টুরিস্ট বাস ধরতে বেরিয়ে গেছেন—শ্রবণবেলগোলা বেলুর ও হালেবিড দেখবেন। কিন্তু আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন না কেন! ট্যাক্সিতে অর্ধেক ভাড়া দেবার কথা এঁরাই আমাকে বলেছিলেন। পেছনে দুজন বসতেন, আমি সামনে। তাতে এঁদেরও অসুবিধা কিছু ছিল না। কিন্তু রাতের অভিজ্ঞতায় মনে হচ্ছে যে ট্যাক্সি নিশ্চয়ই নেন নি। তবে কি কোন সরকারী গাড়ি সংগ্রহে সক্ষম হয়েছেন! সে ক্ষেত্রে আমাকে সঙ্গে নেবার কোন প্রয়োজন নেই, বরং অন্য কেউ হয়তো সঙ্গে থাকতে পারেন।

আমার হাতে একটা গোটা দিন সময় আছে। কোথায় যেতে পারি, ভাবতে ভাবতেই পথে নামলাম। সোমনাথপুরের মন্দির তো বেলুর ও হালেবিডের মতোই সুন্দর। একই স্থপতি নাকি এই তিনটি মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন। সোমনাথপুর কাছে। এই মন্দিরটি দেখে এলে বেলুর ও হালেবিডের মন্দিরের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে যাবে।

এমনি সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হলাম। সোমনাথপুরের নাম বলতেই দু একজন চিনতে পারল, কিন্তু আমি একা দেখে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। বললাম: একা যাব, ভাড়া বেশি বললে বাস ধরব।

আমার কথায় যে যুক্তি আছে, তা বুঝতে পেরে একজন ফিস ফিস করে বলল : সকালে বউনির সময় বেশি বলব না। কুড়ি টাকা দেবেন।

আমি আর কোন কথা না বলে তার গাড়িতে উঠে বসলাম।

প্রায় নতুন গাড়ি। অ্যাম্বাসাডার মার্ক টু। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম যে লোকটার ক্ষতি হবে না। সাত আট টাকা লাভ থাকবে। পেট্রোলের দাম তখন কম ছিল।

আমাদের ট্যাক্সি মাইসোর শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে গেল। কিন্তু পথঘাট সুন্দর। সকালের মিষ্টি হাওয়ায় একা একখানা নতুন গাড়িতে চেপে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

অনেকটা পথ এগিয়ে যাবার পর ছোট একটা বসতি দেখা গেল। কিছু দোকানপাট, ফলের দোকান, চা ও মিষ্টি। গাড়ির গতি মন্থর হতে দেখেই বুঝতে পারলাম যে এইবারে বোধহয় অন্য পথ ধরতে হবে। কিন্তু এই অনুমান ঠিক কিনা তা দেখবার আগেই আমাকে গাড়ি থামাতে হল। ড্রাইভারকে আচমকা নির্দেশ দিয়ে গাড়ি থামিয়ে আমি নেমে পড়লাম।

একটা চায়ের দোকানের সামনে একখানা বেঞ্চের উপরে মিসেস বাসুদেবনকে আমি বসে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু মিস্টার বাসুদেবনকে দেখতে পাই নি। তাঁর আরক্ত মুখ দেখে মেজাজ উত্তপ্ত বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন : আপনি এখানে ?

বললাম : সোমনাথপুর যাচ্ছিলাম, আপনাকে দেখে গাড়ি থামিয়েছি। মিস্টার বাসুদেবন কোথায় ?

মিসেস বাসুদেবন বললেন : এখান থেকে সোমনাথপুরে যাবার কী ব্যবস্থা আছে, তাই জানতে গেছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : এখানে এলেন কী করে ?

—বাসে।

—বাসে ?

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি নির্বিকার ভাবে বললেন: সোমনাথপুর এখান থেকে তিন মাইল। অন্য দিক থেকে আর একখানা বাস এসেছিল। কিন্তু ভিড়ের জন্যে উঠতে পারি নি।

বললাম: আমার গাড়িতে এসে বসুন, মিস্টার বাসুদেবনকে আমি খুঁজে আনছি।

ভদ্রমহিলা অসঙ্কোচে এগিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন। মিস্টার বাসুদেবনকেও দেখতে পেলাম। তিনি খানিকটা তফাতে আমার ড্রাইভারের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। আমাকে দেখিয়ে দিতেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন: আপনি!

বললাম: উঠে পড়ুন।

বলে তাঁকে পিছনের সীটে তুলে দিয়ে নিজে সামনে ড্রাইভারের পাশে বসলাম।

সোমনাথপুরের মন্দির এখান থেকে দূরে নয়। গাড়ি একেবারে মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লাম।

কোনও বিরাট গোপুর চোখে পড়ল না, মন্দিরের উঁচু চূড়াও দেখতে পেলাম না। দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মন্দিরটির ভার নিয়েছে বলে দরজার কাছে টিকিট কাটতে হল। অঙ্গনে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এমন সুন্দর শিল্প মণ্ডিত একটি মন্দির যে দেখতে পাব, এ ধারণা ছিল না।

তারার মতো আকৃতির একটির ভেতরে এক সঙ্গে নির্মিত তিনটি মন্দির। নিচু নিচু তাদের শিখর। কিন্তু বাইরের পাথরে কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

একটুখানি পথ এগিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠেছে। দুধারে দুটি মন্দিরের শিখর। তৃতীয় শিখরটি অনেকটা পেছনে বলে কাছ থেকে

দেখা যায় না। উপরে উঠে চারি ধারে ঘুরে পাথরের গায়ে কারুকার্য দেখতে হয়।

একজন গাইড আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। পয়সা দিতে হবে ভেবে মিষ্টার বাসুদেবন তাকে ধমক দিতে যাচ্ছিলেন, আমি বললাম: দেখিয়ে দিক সব কিছু, তা না হলে অনেক কথাই জানা যাবে না।

তার কাছেই জানলাম যে এই মন্দিরকে বলে ত্রিকুটাচল। মানে, তিনটি শিখর বিশিষ্ট মন্দির। সামনের দুটি মন্দির উত্তর দক্ষিণে মুখোমুখি। মাঝখানে মুখ্য মণ্ডপের পেছনে মূল মন্দির কেশবের। উত্তরের মন্দিরে আছেন জনার্দন, আর বেনু গোপাল দক্ষিণের মন্দিরে।

গর্ভগৃহে কোন বাতি নেই। কিন্তু আমাদের গাইড একটা বাতি এনে ভেতরটা দেখিয়ে দিল। বিজলির বাতি, লম্বা তারের মাথায় বাল্‌ব্ জ্বলছে। অজন্তা গুহায় যেমন করে দেওয়ালের ফ্রেস্কো দেখায়, তেমনি করেই এখানে দেবতার মূর্তি দেখাল।

কেশবের প্রাচীন মূর্তিটি এখন নেই। তার জায়গায় একটি সাধারণ মূর্তি বিরাজ করছে। গর্ভগৃহের দ্বার ও সুখনাশী দ্বারও প্রচুর কারুকার্য মণ্ডিত। কোথাও বিষ্ণুর মূর্তি, কোথাও লক্ষ্মী-নারায়ণের, কোথাও বা দশাবতারের মূর্তি। দ্বারের দুধারে দ্বারপাল।

জনার্দন ও বেনুগোপালের মূর্তি দুটি মানুষ প্রমাণ। ছ ফুটের মতো উঁচু। জনার্দন চতুর্ভুজ বিষ্ণু, আর বেনুগোপাল হলেন বংশীধারী কৃষ্ণ। হাতের বাঁশিটি তাঁর ভেঙ্গে গেছে। এই দুটি গর্ভ-গৃহের দ্বারে ও সুখনাশী দ্বারেও কারুকার্যের অন্ত নেই।

প্রভাতের প্রসন্ন রৌদ্রে বাইরের শিল্পকর্ম আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নিচে থেকে কয়েক সারি কারুকার্যের পরে বড় বড় মূর্তির সারি। প্রথম সারিতে হাতি, দ্বিতীয়ে অশ্বারূঢ় পুরুষ,

তারপরে এক সারি জ্যামিতির নকসা! এর উপরে পুরাণের কাহিনী, জীবজন্তু ও নানা ধরনের মূর্তি।

গাইডের কাছে জানা গেল যে, এই মন্দিরের গায়ে বড় মূর্তির সংখ্যা হল একশো চুরানব্বুই, তার মধ্যে একশো চৌদ্দটি নারীর। আশিটি পুরুষ মূর্তির মধ্যে সত্তরটির বিষ্ণুর নানা রূপের, বাকি দশটির মধ্যে আছেন শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্য, চন্দ্র, মন্মথ ও গরুড়।

পায়ের নিচের পাথর তখনও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নি বলে, এই সব মূর্তি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখবার সুযোগ পেলাম।

মন্দির দেখে বেরোবার সময় একটি লেখার উপরে নজর পড়ল। লেখা আছে যে গাইডকে কিছু দেবেন না। সে তার কর্তব্য মাত্র করেছে। পকেট থেকে পয়সা বার করছিলাম, এই লেখাটি দেখে থমকে গেলাম। গাইডও বুদ্ধিমান। আমার ভাবান্তর দেখেই সে সরে গেল।

বাইরে বেরিয়ে মিস্টার বাসুদেবনকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এইবার ফিরবেন তো?

মিষ্টার বাসুদেবন তাকালেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন: আমরা একটু পরে ফিরব।

মানে, আমি একা ফিরে যেতে পারি?

মিস্টার বাসুদেবন বললেন: ফেরারও তো ঝঞ্ঝাট আছে!

কিন্তু তারপরেই স্ত্রীর চোখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন।

আমার ড্রাইভার তখন একটা গাছের নিচে বসে আরাম করছিল। তার কাছে গিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে পথেও ফেরা যায় শুনেছি। পথ বোধ হয় মাইল তিনেক বেশি। আমার কথায় ড্রাইভার সেই পথে ফিরতে রাজী হয়ে গেল। বলল: বিচার করে বখশিস্ দেবেন।

কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল যে পয়সা খরচা করে গাড়ি চড়বার অভ্যাস এঁদের নেই। সরকারী গাড়ি বিনা পয়সায় ব্যবহার

করে বলেই বোধহয় এই অভ্যাস হয়েছে। আজকের এই ঘটনার পরে এই ধারণা আমার বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। আর এই কারণেই বোধহয় মিসেস্ বাসুদেবনকে আমার কাবেরী সঙ্গম দেখিয়ে দেবার ইচ্ছা হল। এই জায়গাটি দেখতে না পাওয়ার জন্যে তাঁর ক্ষোভের কথা আমি কাল শুনেছিলাম। সেই কথা মনে পড়তেই ড্রাইভারের সঙ্গে আমি ব্যবস্থা করে ফেললাম।

গাড়ির কাছে এসে দরজা খুলে বললাম: আসুন।

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। আর তাঁর স্ত্রী তাকালেন আমার দিকে। আমি বললাম: এমন সঙ্কোচ করছেন কেন? আপনারা উঠলে তো আমাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে না!

ভদ্রলোক বললেন: পুরো ভাড়াই বা আপনি দেবেন কেন?

বলে, তাঁর স্ত্রীকে এগিয়ে যেতে বললেন।

এবারে আর তিনি কোন আপত্তি করলেন না।

তাঁদের পিছনে বসিয়ে, আমি সামনে বসলাম। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে শুরু করল।

এক সময়ে বলল: এখান থেকে সতেরো মাইল দূরে একটা সুন্দর জায়গা আছে। তার নাম শিব সমুদ্রম।

—সমুদ্র?

—না, সমুদ্র নয়। কাবেরী নদীর জলপ্রপাত নিচে নেমেছে দুটি সুন্দর ধারায়। খুব জনপ্রিয় জায়গা।

কিন্তু বাসুদেবন দম্পতি কোন কথা বললেন না।

খানিকক্ষণ পরে মনে হল যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত মৃদু স্বরে কিছু বলাবলি করলেন নিজেদের ভাষায়। আমাকে যে বুঝতে দিতে চান না, তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরে বাইরের দিকে তাকিয়ে পথের শোভা দেখতে লাগলাম।

নতুন পথে আমরা শ্রীরঙ্গপত্তনে এসে পৌঁছলাম। কাবেরীর দুই শাখার মধ্যে অবস্থিত এই দ্বীপটি। একদা টিপু সুলতানের রাজধানী

ছিল। তাঁর দুর্গ আছে, দুর্গের মধ্যে হিন্দুর মন্দির। দরিয়া দৌলত নামে তাঁর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ কাবেরী নদীর তীরে। এর ভেতরের রঙীন চিত্র এখনও দর্শকদের মুগ্ধ করে। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিও এইখানে, তার নাম গম্বুজ। কিন্তু ড্রাইভারকে আমি বললাম: প্রথমে কাবেরী সঙ্গমে চল।

একটি ছায়াছন্ন স্থানে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। মিসেস্ বাসুদেবনকে আমি বললাম: আসুন।

বলে নেমে পড়লাম। তারপরে হেঁটে একটুখানি এগিয়েই নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম।

অপ্রশস্ত নদী। কিন্তু বড় বড় গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে আছে নদীর ধার। ওপারে ছোট পাহাড়। জলের মধ্যেও স্থানে স্থানে পাথর বিক্ষিপ্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দুটি নদী যে মিলিত হয়েছে, তা ভাল দেখা যাচ্ছে না।

মিসেস্ বাসুদেবন চারিদিকে চেয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তার পরে বললেন: এই তোমার ভাল জায়গা?

মিস্টার বাসুদেবন বললেন: মন্দ কি!

ভদ্রমহিলা বললেন: যে কোন নদীর ধারই তো এই রকম।

বলে তিনি ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

টিপু সুলতানের শ্রীরঙ্গপত্তন দেখে আমরা মাইসোরে ফিরে এলাম। পথে আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনারা কি হোটেলেই ফিরবেন?

ভদ্রমহিলা পাল্টা প্রশ্ন করলেন: আপনি?

—আমি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডেই নামব।

—তবে আমাদেরও ঐখানে নামিয়ে দেবেন।

ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে নেমে, আমি যখন ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছিলাম, বাসুদেবন তখন এগিয়ে এসেছিলেন। বললাম: না না, আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

বলে পঁচিশটি টাকা দিলাম ড্রাইভারের হাতে। তাতেই সে খুশী হয়ে সেলাম করল। জিজ্ঞাসা করল: আবার কখন গাড়ি লাগবে?

বললাম: গাড়ির দরকার হলে আমিই আসব তোমার কাছে।

মিস্টার বাসুদেবন বললেন: আপনি কেন পুরো পয়সা দেবেন?

বললাম: তাতে কী হয়েছে!

বলেই আমি মিসেস্ বাসুদেবনকে দেখতে পেলাম ফুটপাথের উপরে। চোখের ইসারায় স্বামীকে তিনি কাছে ডেকে নিলেন।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, হাতে এখনও অনেক সময় আছে। ইচ্ছে করলে শহরটাও দেখে নেওয়া সম্ভব। পাশ দিয়ে একখানা খালি অটো রিক্সা যাচ্ছিল, টপ্ করে সেখানা আটকে, বললাম: শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাও।

প্রথমেই সে আমাকে নিউ স্ট্যাচু সার্কল দেখাল, তারপরে নিয়ে চললো রাজপ্রাসাদের দিকে। মহিস্যুর রাজার প্রাসাদ এখন রাজভবন হয়েছে—রাজ্যপালের বাসস্থান। প্রাসাদের সংলগ্ন একটি মন্দিরও আছে। কিন্তু এখানে আমরা থামলাম না। এগিয়ে গেলাম চামুণ্ডি পাহাড়ের দিকে।

শহরের পূব দিকে এই পাহাড়ের উপরেই চামুণ্ডেশ্বরীর মন্দির। মাঝপথে সেই বিরাট নন্দী। এক হাজার সিঁড়ি ভেঙে পায়ে হেঁটেও ওঠা যায়। আবার মোটর, বাস প্রভৃতি যানবাহনও পাহাড়ের উপরে উঠছে। ফুল আর মালায় সাজানো এই পাহাড় সন্ধ্যাবেলায় ভারি সুন্দর দেখায়।

ললিতা মহল দেখব কিনা, ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিলাম, দেখব না। তাই সোজা আমাকে পাহাড়ের চামুণ্ডি দেবীর মন্দিরের সামনে নামিয়ে দিল। ফুল ও মালায় সাজানো মূর্তি দেখে মনে হল যে, দেবী দুর্গাকে সিংহের উপরে দেখলাম। সোনা রূপা, হীরা, জহরতে ঝলমল্ করছে মূর্তি।

পাহাড় থেকে নেমে আসবার পরে দেখলাম পাথরের সেই বিরাট নন্দী। মানুষকে তার পাশে বামন বলে মনে হচ্ছে। আর এইখান থেকেই দেখা গেল মহিসুর শহরের অপরূপ শোভা। নিচে থেকে চামুণ্ডি পাহাড় যেমন সুন্দর দেখেছিলাম, উপর থেকে শহর তার চেয়েও সুন্দর দেখাল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম, তার পরে নেমে এলাম।

ফেরার পথে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল: বৃন্দাবন গার্ডেনে যাবেন?

সে যে শহর থেকে মাইল দশেক দূরে তা জানি। আর ফোয়ারার আলো জ্বলবে না দিনের বেলায়। তাই বললাম: এখন থাক। তার বদলে হোটেলে আমাকে পৌঁছে দাও।

বলে, হোটেলের নাম বললাম।

চলতে চলতে মনে হল যে সত্যিই একটি সুন্দর শহর দেখলাম। গাছপালা ফুল লতাপাতা বাগান ঘর বাড়ি দোকান পাট, আর একটার পর একটা সার্কল—সবই সুন্দর। অল্প সময়েই এই শহর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে, বৃন্দাবন গার্ডেনও দেখে এলাম। কাবেরী নদীকে বেঁধে যে জলাশয় তৈরি হয়েছে, তার নাম কৃষ্ণরাজ সাগর। এই বাঁধের নিচেই বৃন্দাবন গার্ডেন—একটি সুন্দর ফুলের বাগান। কৃষ্ণরাজ সাগর হোটেল ও ট্যুরিষ্ট রেষ্ট হাউস। নদীর মাঝেও একটি দ্বীপের মতো বাগান। মোটর লঞ্চে চেপে অনেকেই সেখানে যাচ্ছে। জলের ভেতর থেকেও ফোয়ারার জল অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠছে।

ঘুরে ঘুরে আমি বাগান আর জলের ফোয়ারাগুলো দেখলাম। শুনলাম যে আজকাল রোজই বাতি জ্বলে। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই সেই বাতি দেখতে পাব।

একজন বললেন: ভারতের সর্বত্রই আজকাল এই রকম বাগান

দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে বাঁধ তৈরি হচ্ছে, সেখানেই বাগান দেখতে পাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই ফোয়ারায় বাতি জ্বলল। তার আগেই অনেক বাস ও মোটর গাড়ি এসেছিল বাগানে। দর্শনার্থীরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিল এই বাতির জন্যে। অন্ধকার একটু ঘনিয়ে আসতেই মনে হল, যে এই বিরাট এলাকা যেন পরীর রাজ্যে পরিণত হয়ে গেছে।

রাত পৌনে এগারটায় ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ছাড়ল। এই ট্রেনে জায়গা না পেলে সেই বিকেল চারটের ট্রেনেই ব্যাঙ্গালোরে চলে যেতাম। কিন্তু রিজার্ভেসন পেয়ে ক্লোকরূমে মালপত্র রেখে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

আমার এই ট্রেন সকাল সাড়ে পাঁচটার আগেই ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছবে। আর ম্যাড্রাস এক্সপ্রেস পাব সোয়া সাতটার পরে। নিশ্চিন্ত মনে আমি রাতে ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু জেগে দেখলাম যে গাড়ি কোনখানে লেট হয়ে গেছে, সময় মতো ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছবে না।

খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। কিন্তু একজন যাত্রী বললেন: ভাবনা করবেন না। দুপুর দুটোয় ছাড়বে বৃন্দাবন এক্সপ্রেস। সন্ধ্যা সাতটার পরেই ম্যাড্রাসে পৌঁছে যাবেন।

রঙ্গরাজনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। এই বৃন্দাবন এক্সপ্রেসের নাম আমি তাঁর মুখেই শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ব্যাঙ্গালোরে আসার জন্যে এই ট্রেনের নাম করেছিলেন, ফেরার জন্য নয়।

ম্যাড্রাস থেকে আমাদের হাওড়া মেল ছাড়বে রাত প্রায় পৌনে ন'টায়। তাই ভাববার খুব প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে ট্রেনও লেট হলে? খানিকটা দুর্ভাবনা নিয়েই আমি ব্যাঙ্গালোরে এসে নামলাম। আর শুনলাম যে ম্যাড্রাস এক্সপ্রেস খানিকক্ষণ আগেই ছেড়ে চলে গেছে।

অভ্যাস মতো ওয়েটিং রূমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। তারপরে ক্লোকরূমে মালপত্র জমা করে গেলাম প্রাতরাশের জন্যে।

খেতে বসেই দুর্ভাবনা আমার দূর হয়ে গেল। ব্যাঙ্গালোরে কী দেখা যেতে পারে, সেই চিন্তায় মন ভরে গেল। আশ্চর্য এই মন! চারিদিকে প্রসারিত এই সুন্দর পৃথিবীকে দেখবার জন্যে যেন উন্মুখ হয়ে আছে। আমি নিজেই নিজেকে দেখে আশ্চর্য হই।

প্রাতরাশ সেরেই আমি একটা অটোরিক্সা ধরে বেরিয়ে পড়লাম। এ অন্য জাতের শহর। একেবারে আধুনিক, বড় বড় কল কারখানার জন্যেই বেশি বিখ্যাত। বর্তমানে এই শহর মহিস্থুর রাজ্যের রাজধানী। রাজ্যের নতুন নাম হয়েছে কর্নাটক।

লালবাগ এই শহরের বটানিক্যাল গার্ডেন। হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের তৈরি এই বাগানটি সত্যিই দেখবার মতো। শহরের মধ্যে এটি বিরাট এলাকা জুড়ে আছে। ভেতরে পদ্মফুলের পুকুর ও হরিণের আবাস আছে। পুরনো প্রাচীন গাছে ছায়াচ্ছন্ন মনোরম এই বাগান।

এর পরে কুব্বন পার্কে বিধান সৌধ দেখে ফিরে এলাম। পরে শুনলাম যে এখানে দেখবার মতো আরও জায়গা ছিল—কেম্পে-গৌদার দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি একটি কাদার দুর্গ। দু'শো বছর পরে হায়দর আলি ও টিপু সুলতান তাকে মেরামত করে ব্যবহারের উপযোগী করেছিলেন। গঙ্গাধরেশ্বরের মন্দিরও দেখবার মতো। কিন্তু দেরি হয়ে যাবায় ভয়ে আর আমি স্টেশন ছেড়ে বেরোলাম না।

না, বৃন্দাবন এক্সপ্রেসে দেরি হয় নি। ঠিক সময় মতোই ম্যাড্রাসে এসে পৌঁছে গেলাম।

আমি ভাবতে পারি নি যে রঙ্গরাজনের সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। তাই ওয়েটিং রুমে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রঙ্গরাজনই আমাকে আগে দেখেছিলেন। দম দেওয়া পুতুলের মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন।

প্রথমে তিনি আমার সব কথা জেনে নিলেন। তারপরে বললেন নিজের কথা। তিরুপতি থেকে তাঁরা দাদর-ম্যাড্রাস এক্সপ্রেসে কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছেন। হাওড়া মেলে আমরা এক সঙ্গেই ফিরব। আমার রিজার্ভেসন তিনি দেখে এসেছেন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : ম্যাঙ্গালোরে সমুদ্র দেখেছেন?

বললাম : না। কিন্তু আপনার কথা মতো পাহাড় দেখেছি।

—মঙ্গলা দেবীর মন্দির দেখেছেন? যাঁর নামে শহরের নাম হয়েছে ম্যাঙ্গালোর?

আশ্চর্য হয়ে বললাম: এ মন্দিরের কথা তো আপনি আমাকে বলেন নি!

—দেখেন নি! গণপতির মন্দির?

—তাও দেখি নি।

—সুলতান্স্ ব্যাটারি নিশ্চয়ই দেখেছেন। টিপু সুলতানের দুর্গ? এ সব তো শহরের মধ্যেই ছিল!

বললাম: এ সব দেখবার কথা তো কেউ আমাকে বলেন নি!

—ইস্!

বলে ভদ্রলোক যেন মুষড়ে পড়লেন।

তারপরে নূতন উদ্যমে জিজ্ঞাসা করলেন: তবে আপনি উডিপি দেখতে চলে গিয়েছিলেন?

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম।

—তাহলে বোধ হয় অন্য ধারে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন!

আমি না বলতেই ভদ্রলোক বললেন: তবে নিশ্চয়ই ধর্মস্থলে একদিন কাটিয়ে এসেছেন!

বললাম: সে জায়গার নামও তো বলেন নি!

—বলি নি? কানাড়ার অত বড় তীর্থস্থান, তার নাম বলিনি আপনাকে!

বলে তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

আমি এবারে দেখতে পেলাম তাঁর স্ত্রীকে। নিঃশব্দে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর তাঁর সেই কন্যা প্রচুর আগ্রহ নিয়ে শুনছে আমাদের কথোপকথন।

পরিশ্রান্ত ভাবে রঙ্গরাজন এবারে মন্তব্য করলেন: তবে আপনি কানাড়ায় কী দেখে এলেন?

তাঁর এই মন্তব্যে আমার মনে হল যে সত্যিই আমি কানাড়ায় কিছুই দেখি নি।

তবু বললাম: যতটুকু বলেছিলেন, ততটুকুই দেখে এসেছি। আপনার পরামর্শ মতো ওয়েস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ধরে যাবার জন্যে একটা দিন সময় বেশি পেয়েছিলাম। তাই ঠিক যেমনটি বলেছিলেন, তেমনি করে কুর্গ রাজ্যটা দেখে এসেছি। আর মাইসোর থেকে সোমনাথপুরমের মন্দির। এ যাত্রায় আমার আর কোন ক্ষোভ নেই।

আমার কথায় প্রচুর আত্মপ্রসাদ পেলেন ভদ্রলোক। তারপরে নিজের স্ত্রী কন্যার দিকে তাকিয়ে, নিজের ভাষায় গড়গড় করে যা বলে গেলেন, তার বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারলাম না।

এক সময় আমার দিকে ফিরে বললেন: স্ত্রীলোকের এই একটা দোষ। নিজেরাও কিছু জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না। আর ভাবে যে পুরুষেরা সুবিধা পেলেই মিথ্যে কথা বলে। তা বলব কেন! নিজের জানা থাকলে বলব, না থাকলে বলব না। তা নয়, আমাকে এরা চেপে ধরল যে কোন কথাই বলতে পারব না। তীর্থ করতে যখন যাচ্ছি, তখন মিথ্যে বলে পাপ সঞ্চয়ের দরকার নেই! আপনিই বলুন, আপনার যে কিছু দেখা হল না, এতে কোন্ পুণ্য হল আমার?

ভদ্রমহিলাও বোধহয় বাঙলা অল্প অল্প বোঝেন। লজ্জিত ভাবে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর কৌতুকের হাসি দেখলাম তাঁর কন্যার মুখে।

আমার আরও দুজনের কথা মনে পড়ল—ম্যাঙ্গালোরের গাড়িতে সেই সহযাত্রী ভদ্রলোক আর মাইসোরের বাসুদেবন। তাঁরাও কি প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন তাঁদের স্ত্রীদের আচরণের!

সমাপ্ত